৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের দাঁতে সহজেই ক্যাভিটি হতে দেখা যায়। এসব বছরেই দাঁত ক্যাভিটির কবলে পড়ে। তাই দাঁত পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য আপনার বাচ্চাকে নিয়মিতভাবে দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। ত'বে রোজ আপনি নিজের বাড়ীতে বসে সহজেই দাঁতের ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ ক'রে।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে জীবাণু সৃষ্টি হয়। ফলে, মুখে দুর্গন্ধ এবং পরে যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের ক্ষয় শুরু হতে পারে। কলগেটের অপূর্ব্ব সক্রিয় ফেনা দাঁতের ভেতরে গভীরে পৌঁছে বিপজ্জনক খাবারের টুকরো আর জীবাণু দূর ক'রে দেয়। তাই আপনার বাচ্চাকে, প্রতিবার খাওয়ার পর কলগেট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে শেখান। বাচ্চারা কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালওবাসে। কারণ, এতে আছে সতেজ পিপারমিণ্টের স্বাদ।

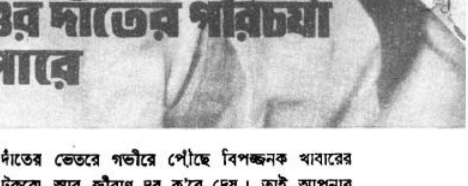

জীবাণুমুক্ত নির্ম্মল শ্বাস প্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশী কেনে কলগেট টুথপেস্ট।

আনন্দমেলা

৯ আশ্বিন ১৩৮৬ • ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ • ৫ বর্ষ • ৯ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

মায়ের মুখে শুনেছি। অনীতা বসু পাফ ৪

ছড়া

তসবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯
ঘোড়ায়-চড়া বর। অরুণ সরকার ২৫
কাকের বাসা। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৩৩
শখের গোয়েন্দা। আনন্দ বাগচী ৪৭

গল্প

তেঁতুলমামার জগৎ। হিমানীশ গোস্বামী ১০
রাজার বাঁশি। বাণীব্রত চক্রবর্তী ৩৭
রানার মা-বাবা। বিকাশ বসু ৫৮

উপন্যাস

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫
কে। বিমল মিত্র ২৭

আত্মকথা

খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ৩১

কমিক্স

সদাশিব ১৯, রোভার্সের রয় ২০, টিনটিন ২২
বিশ্বকাপ ২৪, টারজান ২৬, বাঘা ৬০, গাবলু ৬৪

লেখাপড়া

ভাষার খেলা। কুন্তক ৪৮
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৯
'হুগলি বিনোদিনী'র প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৬২
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৬৩

খেলাধুলো

ফুটবলে ডিস্টিংশন। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫১
গোলের ফাঁদ, ভুলের ফাঁদ। ফাইটার ৫৩
শীল্ড পেল মোহনবাগান। অশোক দাশগুপ্ত ৫৫

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ১৩, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
মণিমেলার খবর ৪১, তোমাদের পাতা ৪৩
নদনদী ৪৫, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ বিপুল গুহ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

নীতুর দুঃখ

প্রিয় বন্ধুরা,

বর্ষাকালে কলকাতাটা যা গুবলেট হয়ে যায় তাতো আমাদের জানাই আছে। তবে জলজমা রাস্তায় রাবারের বল নিয়ে খেলতেও কিন্তু দারুণ জমে। আর বাড়ি ফিরে মা'র হাতের খিচুরী।

কিন্তু এগুলো তো নতুন কথা নয়। নতুন হল আমি এবার বর্ষায় দুটো গাছ লাগিয়েছি। নিজের হাতে। আর গাছ দুটো বে'চেও গেছে বর্ষার জল পেয়ে।

কোথায়?

আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে। একটা হল পিপুল গাছ, আর একটা কি যেন ফুলের গাছ। নামটা......। দাঁড়াও ইংরেজী নামটা মনে পড়লেই ফস করে লিখে নেবো। আসলে নামটা তো বাবা বলে দিয়েছিলেন কি না।

আমার গাছে নতুন পাতা এসেছে। আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে গাছটাকে ঘিরে দিয়েছি। যাতে গরুতে না খেয়ে ফেলে।

ফুটপাতের বকুল ফুল দেখে আমার মনে হ'ত কে এইসব গাছ লাগিয়ে ছিল?

আমার লাগানো গাছ যখন মানুষকে ছায়া দেবে, তখন আমি কত বড় হয়ে যাবো। গাছটাও বড় হচ্ছে। আমিও বড় হচ্ছি। রোজ রোজ।

কলকাতায় আমার নিজের হাতে পোতা দুটো গাছ আছে ভাবলেই আমার ভোর বেলা ঘুম ভেঙে যায়।

দৌড়ে গিয়ে গাছ দুটো দেখি। কিন্তু কাল রাতে কোন্ বাড়ি থেকে জানি না, আমার ফুলের গাছটার ওপর রাজ্যের নোংরা ফেলে গেছে।

যাতা! কিছুতেই লোকেরা যেখানে সেখানে বাড়ির নোংরা ফেলা বন্ধ করবে না। জানলা দিয়ে, ব্যালকনী থেকে ছুঁড়ে মারলেই হ'ল। গাছটাতো কোন দোষ করেনি। বল?

কলকাতাটা তো আমাদের? আমরাই যদি নোংরা করি তবে আর কলকাতাকে কে ভালবাসতে যাবে বল?

তোমরাও কি এই নিয়ে ভাবছো না?

ইতি,
নীতু (ক্লাশ VI)

জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলিকাতা ৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত।

মায়ের মুখে শুনেছি

অনীতা বসু পাফ

ইউরোপে যে ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ বাধবে, অনেকে না-পারলেও আমার বাবা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই যুদ্ধ যখন বাধল, বাবার তখন মনে হল যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার পক্ষে এ এক মস্ত সুযোগ। বিদেশী শাসকদের নজর এড়িয়ে ছদ্মবেশে সেই সময়ে তিনি ইউরোপে চলে যান। কীভাবে গিয়েছিলেন, তা তোমরা নিশ্চয় জানো। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তারই জন্যে ইউরোপে গিয়ে তিনি অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মেলান। অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে ভারতবর্ষের বিদেশী শাসকদের উপরে আক্রমণ চালাবেন, এবং তাদের বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবেন, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তার জন্য তিনি একটি কর্মসূচী ছকে নিয়েছিলেন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী ইউরোপ থেকে ডুবোজাহাজে করে তিনি জাপানের পথে রওনা হয়ে যান।

তার কিছুকাল আগে আমার জন্ম। যুদ্ধের মধ্যে বাবা যখন ইউরোপ ত্যাগ করেন, আমার বয়স তখন কতই বা হবে। এই ধরো মাস-তিনেক। ওই বয়সের কথা কারও মনে থাকে না। আমারও নেই। আর-একটু বড় হয়ে অবশ্য মায়ের কাছে বাবার কথা মাঝেমধ্যে শুনেছি। আজও শুনি। তারই কিছু-কিছু আজ তোমাদের শোনাব।

মা বলেন, বাবা ছিলেন দারুণ ব্যস্ত মানুষ। যখন তিনি কাজে বসতেন, তখন একেবারে মগ্ন হয়ে কাজ করতেন, অন্য-কোনও দিকে তাঁর নজরই থাকত না। টেবিলে বসে একরাশ কাগজপত্র নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তন্ময় হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, শুধু মাঝেমধ্যে

জ্যাঠতুতো দাদা-বউদি আর ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে নেতাজী-কন্যা অনীতা

ভাইঝি শর্মিলার সঙ্গে অনীতা

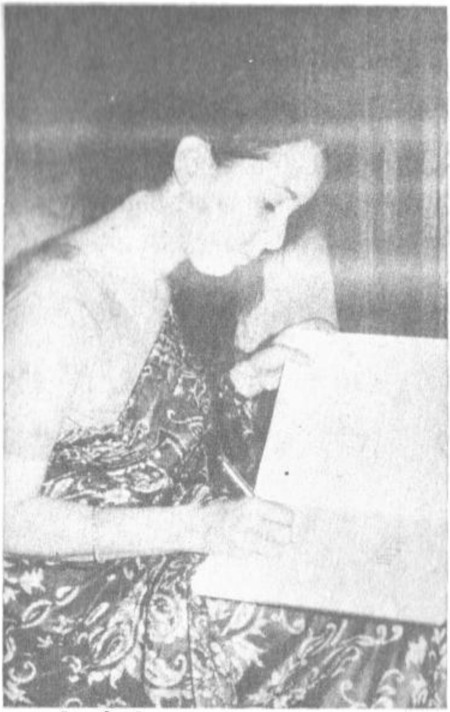

বাবার চিত্রজীবনী। গ্রন্থে স্বাক্ষর করছেন মেয়ে

চুমুক দিচ্ছেন কফির পেয়ালায়, বাবার এই ছবিটা আমার মায়ের আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। রাত গভীর হত, সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু বাবা তবু কাজ ছেড়ে উঠতেন না। ডাক্তাররা এই নিয়ে অনুযোগ করতেন। বলতেন, এটা ভাল নয়, এতে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাবার এই রাত জেগে কাজ করবার অভ্যাস তবু পালটায়নি।

তবে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন বলে যে তিনি খেলাধুলো ভালবাসতেন না, তা নয়। আমার বিষয়ে নাকি প্রায়ই বলতেন, "অনীতা যাতে খেলাধুলো ভালবাসে, সেদিকে নজর রাখা চাই।" নিজে ভালবাসতেন হাঁটতে। টান হয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। বিকেলের দিকে মাকে নিয়ে প্রায়ই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন। তখন তাঁদের সঙ্গে থাকত একটি পোষা কুকুর। এই নিয়ে আমার মায়ের কাছে একটা মজার গল্প শুনেছি। মা বলেন, বাবা এতই দ্রুত আর এতই তাড়াতাড়ি হাঁটতেন যে, মাকে প্রায়ই পিছিয়ে পড়তে হত। তখন কুকুরটা পড়ত মহা সমস্যায়। বেচারা ঠিক করে উঠতে পারত না যে, কার সঙ্গে থাকবে। মায়ের, না বাবার। এক-

জ্যাঠামশাই শরৎচন্দ্র বসু এবং জ্যাঠাইমা বিভাবতী বসুর সঙ্গে ছোট্ট অনীতা। পিছনের সারিতে মাঝখানে অনীতার মা

একবার দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ধরে ফেলত, আবার তার খানিক বাদেই উলটো দিকে দৌড় লাগিয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসত। দেখে বোঝা যেত যে, বেচারা বড্ড দোটানায় পড়ে গেছে।

আমার মা একটু ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের মানুষ। খুব-বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যা বলেন, তার থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, ছেলেমেয়েদের কীভাবে বড় করে তোলা উচিত, বাবার সে-বিষয়ে স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য তিনি দেখতেন না। বলতেন, সমাজকে গড়ে তোলবার ব্যাপারে যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদেরও একটা জরুরি ভূমিকা রয়েছে। মা বলেন, আমার বাবা ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক। বাবা নাকি প্রায়ই বলতেন যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে কোনও সমাজ কখনও সত্যিকারের মুক্তি পেতে পারে না।

একদিকে আমার বাবা যেমন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি ছিলেন কোমল মনের মানুষ। এও আমি মায়ের কাছেই শুনেছি। মা বলেন, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা দেখতে পান যে, একজন বুড়ো মানুষ রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছেন। দেখে বাবা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, একটা বয়সের পর মানুষকে যাতে আর উদরান্নের জন্য এত খাটতে না হয়, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মা আরও বলেন যে, বাবা খুবই সংগ্রামী মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু সেই সংগ্রামের মধ্যেও কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তাঁর ছিল না। এমনকী, দীর্ঘদিন ধরে যারা ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, এবং তাঁর জন্মভূমি থেকে যাদের তিনি বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, সেই ইংরেজদের বিরুদ্ধেও না। আসলে তাঁর লড়াই ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সেই নীতির বিরুদ্ধে, যা অন্য দেশের উপরে প্রভুত্ব করতে চায়।

অন্যদিকে, আমার বাবা জার্মানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু হিটলারের জাতিবিদ্বেষী নীতিকে তিনি কখনও সমর্থন করেননি। জার্মানিতে বসেও খোলাখুলি তিনি বলতেন যে, এটা মনুষ্যত্বের বিরোধী ব্যাপার, এবং এর চেয়ে অন্যায় আর কিছুই হতে পারে না।

ডঃ শিশিরকুমার বসুর সঙ্গে অনীতা

বড় হয়ে আমার মায়ের কাছে এ-সব কথা শুনেছি। মায়ের কাছে আরও জেনেছি যে, ভারতবর্ষকে তিনি কত গভীরভাবে ভালবাসতেন।

সেই ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয়বার আমি এলাম। আবার আসব। আমি বিশ্বাস করি, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে এ-দেশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। বাবা তো এক সুন্দর সচ্ছল সুখী ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হবে।

ফোটো বিপুল গুহ

তসবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাতাসা কদমা মিছ্‌রি।
দিনটা কী বিশ্রী!
রস পাটালি ঝোলাগুড়।
পায়ের ছাপ—কোন্ জন্তুর ?
মুড়কি মোয়া তিলের-চাক।
সন্ধে জ্বালো, বাজে শাঁখ।
মধু চিনি ভুরো।
কোথায় যাচ্ছ, খুড়ো ?
নাড়ু খাজা মোরব্বা।
গলায় তস্‌বি পরনে জোব্বা॥

ছবি দেবাশিস দেব

ছবি অলোক ধর

তেঁতুলমামার জগৎ

হিমানীশ গোস্বামী

সমস্যা একটা হলেই হল, তেঁতুলমামা তার সমাধান করে ফেলবেনই। আবার যেখানে সমস্যা-টমস্যা তেমন নেই, সেখানে তেঁতুল-মামাকে নিয়ে হাজির করো, দেখবে দিব্যি সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলেছেন তিনি।

আচ্ছা, নামটা ওরকম অদ্ভুত হল কেন? তেঁতুল নামটা কী-রকম যেন! জানি এমন একটা প্রশ্ন তোমরা করবেই। ঠিকই বলেছ, নামটা তেমন মিষ্টি নয়, তাই তো? একটু টক-টক ভাব। না, একটু কেন—চমৎকার, মানে বেশ টক-টক ভাব। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, লোকটি বোধ হয় তেমন সুবিধের নয়। তেঁতুল যাঁর নাম তিনি নিশ্চয়ই মুখখানাকে মিষ্টি করতে পারেন না, দেখে নিশ্চয়ই ভয়-টয় হয়?

হ্যাঁ, এটাও একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্নটাও তোমাদের মনে আসবে জানা কথা। এর উত্তরে জানাই, উঁহু, তেঁতুলমামাকে দেখে মোটেই ভয় হয় না। যদিও তাঁর চেহারার, মানে মুখের ইঞ্চি তিনেক জায়গা বেশ টুথ ব্রাশের ব্রিসল-এর মতো গোঁফে ভরা। আর তাঁর মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে যখন একদৃষ্টে কারুর দিকে তাকান, কিংবা গর্জন-টর্জন করেন, বা তর্জন-গর্জন করেন, তখন একটু-আধটু ভয় যে একেবারেই করে না তা নয়। তবে মানুষটি একেবারে মিষ্টি।

ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে অবশ্যই

একটা কিছু সমস্যা নিয়ে যেতে হবে, নইলে তিনি খুব দুঃখ করেন। বলেন, আজকালকার ব্যাপারই সব বদলে গেল কেমন। আমাদের আমলে কতরকম সমস্যা ছিল। এক একটা মানুষের অন্তত সতেরো আঠারো করে সমস্যা। এক বাড়িতে সাতজন লোক থাকলে আবার সাত সতেরোং একশো উনিশ প্লাস সাত, সব মিলিয়ে একশো ছাব্বিশটা সমস্যা। আর এখন যা দিনকাল পড়েছে সমস্যা-টমস্যা একেবারে সব হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চললে দু হাজার খ্রীষ্টাব্দে মানুষ সমস্যার অভাবে হাঁফিয়ে-টাফিয়ে মরেই যাবে।

কথাটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? তেঁতুলমামা লোকটিই তো একটু অদ্ভুত। তবে মনে কোরো না, তেঁতুলমামার কথার মধ্যে কোনো পদার্থ নেই। ও'র কাছে গেলেই সেটা টের পাবে। দুটি কথা শুনলেই বুঝতে পারবে তাঁর কথার মধ্যে প্রচুর পদার্থ।

আচ্ছা, ওঁর বয়স কত?

এটাও একটা প্রশ্ন বটে। তেঁতুলমামার নিজের বক্তব্যকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে তাঁর বয়স অন্তত পক্ষে ষাট, কেননা, তাঁর নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার সময় বয়স ছিল কুড়ির উপর। তা যদি হয় তাহলে তাঁর বয়স ষাট বছর তো হবেই, বেশিও হতে পারে।

অথচ...।

হ্যাঁ, ঠিকই। একটা অথচ রয়েছে। দেখতে তাঁকে কিছুতেই ষাট বছরের মনে হয় না। মনে হয়, তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের এক চুল বেশি নয়। তবে ওসব বয়স-টয়স নিয়ে আমাদের দরকার কী। কিছু লোক ঐরকম হয়। তাদের বয়স আন্দাজে বোঝা যায় না।

তোমরা তেঁতুলমামার কাছে যেতে চাও? জানতাম তোমাদের কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার আগে একটা সমস্যা ভেবে বার করো, যে সমস্যা বেশ কঠিন সমস্যা। তা নইলে কিন্তু তেঁতুলমামা খুবই দুঃখিত হবেন।

তেঁতুলমামা কোথায় থাকেন?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নটা তোমরা করবেই জানি। অর্থাৎ তাঁর ঠিকানা তো? কিন্তু এখানে তা তো আর ছাপিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, পুরো ঠিকানা দিলে তোমরা দিন-রাত্তির তাঁকে বিরক্ত করবে হয়তো। সে-সব কিন্তু তিনি খুব অপছন্দ করেন। তবে কিছুটা বলে দিই। তিনি থাকেন কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা গলিতে। একটা পুরনো ধাঁচের ফ্ল্যাট বাড়িতে। তাঁর সঙ্গী রয়েছে একজন পুরনো ভৃত্য এবং সহকারী। লোকটির নাম স্যামু। আসল নাম স্যামুয়েল পিন্টো। সম্পূর্ণ বাঙালি। চমৎকার রান্না করতে পারে। ওর তৈরি চিংড়ির কাটলেট কিংবা দো-পেঁয়াজা যে না খেয়েছে সে জানে না সে কী পেল না জীবনে। আর যে খেয়েছে? তার কথা অনুমান করে নাও।

আর রয়েছে ঐ বাড়িতে একজন, তার নাম খুদে। কিন্তু খুদের লেজ আছে। আবার এটাও বলে দিই, খুদে খুব খুদে নয়। খুদে হচ্ছে একটা চমৎকার কুকুর—জাতে অ্যালসেশিয়ান। তেঁতুলমামার খুব দুঃখ, কুকুরটা বড়ই অলস প্রকৃতির। দরকার না হলে উঠে দাঁড়ায় না। রুটি আর ভাত দিলে ভাত খায়। রুটি ছোঁয় না খুব দরকার না হলে। আর তার একটা বিশ্রী নেশা আছে। খাওয়ার পর তাকে একটা জর্দা - দেওয়া মিঠে পান খেতেই হবে।

কী, চমকে উঠলে কেন? সত্যিই খুদে জর্দা দেওয়া পান খায়। তবে বেশি না, দিনে বার তিনেক। কিন্তু এটাও তেমন চমকপ্রদ নয়। এবার যদি বলি এই খুদের আরও একটা খারাপ অভ্যেস আছে তাহলে তোমরা খুবই অবাক হয়ে যাবে। আমরাও খুব অবাক হয়েছিলাম। প্রথমে বিশ্বাসই করিনি। ঐ খুদেটা ঘন ঘন গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে অম্বুরি তামাক টানে।

এইজন্য তেঁতুলমামা ওকে খুদে না বলে বলেন আলসে নবাব।

এইবার চলো যাওয়া যাক। দেখেই আসি একবার তেঁতুলমামাকে। কী, সমস্যা-টমস্যা কিছু সঙ্গে রেখেছ তো? রেখেছ? সমস্যাটা কী? ও, এই গরমের দিনে লোডশেডিংয়ের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উপায় কী?

বাঃ, চমৎকার সমস্যা। তেঁতুলমামা শুনলে খুশি হবেন।

তেঁতুলমামা ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। খুদে একটু দূরে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। স্যামু দরজা খুলে দিল। তেঁতুলমামা বললেন, "ওরে, সব লোক এসেছে, ভালমন্দ কিছু এনে দাও স্যামুবাবু।"

স্যামু বলল, "যে আজ্ঞে।" বলে চলে গেল।

তেঁতুলমামা উপস্থিত তিন মূর্তিকে দেখলেন। প্রথমে খালি চোখ দিয়ে, পরে চশমা লাগিয়ে। হ্যাঁ, যে তিন মূর্তিকে তিনি দেখলেন তারা হল—সৌম্য, সুপ্রকাশ আর তুষার। থাকে শ্যামবাজারে। পড়ে স্কুলে। তারা একটা সমস্যা এনেছে—সমস্যাটার কথা আগেই বলেছি।

তেঁতুলমামা সমস্যার কথা শুনে খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "স্যামু, চমৎকার কফি বানাও আর তার সঙ্গে অনুপান! হ্যাঁ, সমস্যাটা চমৎকার! চমৎকার!" তেঁতুলমামা উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দুটো খুলে দিলেন, তারপর কী ভেবে জানলা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন, "অবশ্য সমস্যা যা এনেছ তা একটা নয়, আসলে দুটো। গরম হচ্ছে একটা সমস্যা। গরমের সমস্যার সঙ্গে লোডশেডিংয়ের সমস্যা যুক্ত হলে অবশ্য সমস্যাটা বিস্তারলাভ করে, গভীরও হয়। কিন্তু আসলে গরম এবং লোডশেডিং দুটি আলাদা—সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তোমরা চাও গরমকালে যাতে ঠাণ্ডা থাকতে পারো, এই তো?"

তিন মূর্তি একসঙ্গে জানাল—ঠিক তাই।

তেঁতুলমামা বললেন, "তাহলে আমি কিছুক্ষণ ভেবে নিই, কী বলো?"

সুপ্রকাশ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাবুন।"

ইতিমধ্যে স্যামু একগাদা চিংড়ি মাছের বড়া নিয়ে এল, আর সঙ্গে চমৎকার চা। অতএব মিনিট দশেক সময় দিব্যি কেটে গেল। স্যামু খালি প্লেট আর কাপ নিয়ে যাওয়ার পর তেঁতুলমামা বললেন, "স্যামুবাবু, এবারে আলসেটাকে একটু গড়গড়ার ব্যবস্থা করো!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।" বলল স্যামু।

দেখা গেল খুদে স্যামুর পেছন-পেছন চলে গেল পাশের ঘরে, আর তার একটু পরেই আওয়াজ হতে লাগল গবলুম! গবলুম! আর বাতাসে ভেসে আসতে লাগল কী চমৎকার মিষ্টি গন্ধ!

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে তেঁতুলমামা বললেন, "একটা উপায় আমি বার করেছি এটা একটু খরচসাপেক্ষ। এতে ঘর চমৎকার ঠাণ্ডা থাকবে। একটা দিশি উপায় আছে, তা হল খসের পরদা করে দরজায় জানালায় পরদার মতো লাগিয়ে দিয়ে তাতে জল ছিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু হাওয়া না থাকলে খসও বেশ গরম হয়। অর্থাৎ হাওয়া না হলে খসের জল তাড়াতাড়ি উঠে যায় না, আর জল উঠে না গেলে ঠাণ্ডাও হয় না। আসল ব্যাপারটা হল, হাওয়াটা শুকনো হওয়া চাই, আবার হাওয়া চলাচলও করা চাই। একটা উপায় হল, ইলেকট্রিক পাখা চালিয়ে দেওয়া। কিন্তু হাওয়া যদি শুকনো তেমন না হয় তা হলে পাখা যতই চলুক, জল শুকোবে কম, আর ঘরও তেমন ঠাণ্ডা হবে না। আবার লোডশেডিংয়ের সময় পাখাও তো চালানো যাবে না। অতএব, আমি একটা নতুন ধরনের ঘরের পরিকল্পনা করেছি।"

"কী রকম?" তুষার প্রশ্ন করল।

"সেটা হল ঘরের দেয়ালগুলোর সঙ্গে টিন লাগিয়ে দেওয়া।"

"টিন?"

"হ্যাঁ, টিন। সমস্ত দেয়ালে টিন লাগানো হয়ে গেলে দেয়াল বরাবর আট ইঞ্চি টিন লাগাতে হবে সমান্তরাল করে। না, না—তার আগে দেয়ালের টিন থেকে অসংখ্য তাকের মতো করতে হবে। যেন আট ইঞ্চি বহু তাক দেয়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার টিন দিয়ে ঐ তাকগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। তাহলে আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি অনেকগুলো ঢাকা তাক হবে। কিন্তু তারপর যে বাকি দুটো দিক থাকবে তার একটা দিক বন্ধ করতে হবে. এবারে একটা কাণ্ড করতে হবে।''

"কী কাণ্ড?''

''এবারে অসংখ্য সাপ যোগাড় করতে হবে। এ ব্যাপারে সাপ-বিশারদ দীপক মিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। যে সাপ সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা সেই জাতের সাপ এনে প্রত্যেকটি তাকে একটি করে সাপ রেখে তাকের যে মুখটা খোলা ছিল সেটাকে বন্ধ করতে হবে। অবশ্য হাওয়া চলাচলের জন্য টিনের গায়ে পেরেক দিয়ে ছোট ছোট ফুটো করে দিতে হবে। এবারে ভারী মজা। সমস্ত দেয়াল ঠাণ্ডা —আর ঘরে ঢুকলে কোথায় লাগে দামি দামি এয়ার কনডিশনার!''

''ওরে ব্বাবা!''

তেঁতুলমামা বললেন, "এতেও যদি ঘর তেমন ঠাণ্ডা না হয় তাহলে আরও একটা উপায় আছে। ছাতের সঙ্গে লাগানো চ্যাপটা একটা ছাতের সমান টিনের ট্যাঙ্ক বানিয়ে তাতে জল ঢালতে হবে।''

সুপ্রকাশ বলল, "কিন্তু জল তো গরমে তেতে উঠবে!''

তেঁতুলমালা বললেন, "কে বলেছে তেতে উঠবে। ঐ ট্যাঙ্কে পঞ্চাশটা কুমির এবং আলাদাভাবে ছশো ব্যাং থাকবে না? জানো তো এই সব জীবের রক্ত ঠাণ্ডা? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এই সব জীব জলকে ঠাণ্ডা করে রাখবে, ঘর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিব্যি মজার ব্যাপার হবে। তবে কিনা একটা গোলমালও আছে।''

সৌম্য বলল, ''কী গোলমাল?"

তেঁতুলমামা বললেন, ''গোলমালটা আর কিছুই নয়—অত ঠাণ্ডায় শেষে নিউমোনিয়া-ফিউমোনিয়া না হয়! তবে সেজন্য ভাবনার কিছু নেই। শীতকালে যেসব সোয়েটার ইত্যাদি লাগে, সেগুলিকে বার করে নিলেই হল।'' তেঁতুলমামা থামলেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে খুদের গর্জন শোনা গেল। তেঁতুলমামা বললেন, "স্যামু? ও স্যামুবাবু? দেখ তো গড়গড়ার আগুনটা বুঝি নিবে গেল আলসের।''

সেদিনকার মতো বৈঠক ঐখানেই ইতি।

ছবির মজা

এই ছবির মধ্যে বাচ্চা তিনটে ঘোড়া লুকিয়ে আছে। তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে বলো, সে লুকোনো ঘোড়াগুলি খুঁজে বার করুক।

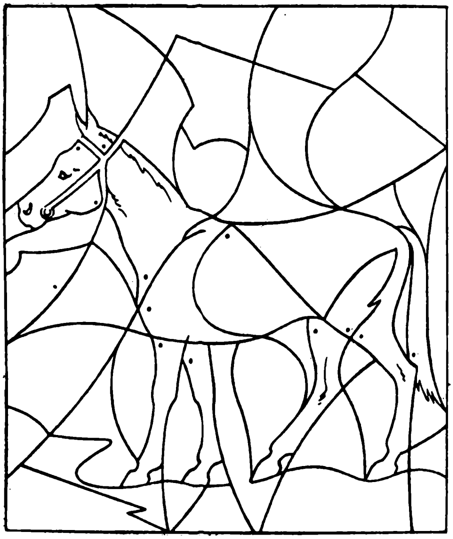

এই ছবির ফুটকি-দেওয়া অংশগুলিতে রঙিন পেনসিল দিয়ে ভরাট করো। তাহলেই একটা টগবগে ঘোড়া পেয়ে যাবে।

ছোটদের যত সেরা বই

বুদ্ধদেব গুহ ছোটদের জন্য কলম ধরেছেন, এ যেমন খুশির খবর, তার থেকেও বড়ো আনন্দের ব্যাপার হল—তিনি যে-কটি বই লিখেছেন সে-গুলি বন-জঙ্গল আর শিকারের পটভূমিকায় লেখা। আর তাঁর এই শিকার-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল, যার চোখ দিয়ে জঙ্গল-মহলের গল্পগুলি শুনিয়েছেন তিনি, সে নিতান্তই এক কিশোর। সেই কিশোরটির মুগ্ধতা ও রোমাঞ্চ, বিস্ময় ও বিহ্বলতা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা এতই সুন্দর ও আন্তরিকভাবে ফুটে উঠেছে যে, বাংলা-সাহিত্যে ঠিক এই স্বাদের বই আর কেউ লিখেছেন বলে মনে পড়ে না।

পার্থসারথি চক্রবর্তী খুব বেশীদিন সাহিত্য রচনা করছেন এমন নয়। তবু এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন কি শো র সাহিত্যের অতি প্রিয় এবং অপরিহার্য একটি নাম। বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোরমনকে আকৃষ্ট করার মতো নির্ভরযোগ্য বই এমনিতেই বাংলা-ভাষায় কম প্রকাশিত হয়। পার্থসারথি চক্রবর্তী শুধু যে সেই অভাবই পূরণ করছেন তাই নয়, বিষয়কে সরস এবং মজাদার, কৌতূহলকর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় কোন জাদুতে তাও তাঁর অজানা নয়। ছোটদের মহলে তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিটি বই নিয়ে হইচই পড়ে যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৫ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৩ মিতুল নামে পুতুলটি ৪ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৬ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৬ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৪ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪ **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ মৌমাছির রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলে-দের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থ-সারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেল্‌কি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৪ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দত্তের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবার এসেছে হিমালয়ে। গোরখশেপ নামে একটা জায়গায় একটা গম্বুজের মধ্যে ওরা থাকে, আর বাইরে তাঁবু ফেলে থাকে শেরপারা ও মালবাহকরা। সন্তুর ধারণা, তারা এভারেস্টে যাবে, কিন্তু কাকাবাবু এখানেই অপেক্ষা করে দূরবিন দিয়ে সব সময় কী যেন দেখেন। কাকাবাবু সঙ্গে এনেছেন একটা কাচের বাক্সের মধ্যে রহস্যময় দাঁত, দেখতে অনেকটা মানুষের দাঁতেরই মতন, কিন্তু সেটা প্রায় দু ইঞ্চি, অত বড় দাঁত কোনো মানুষের হতে পারে না। ঠিক ঐ রকমই আর-একটা দাঁত কেইন শিপটন নামে একজন অভিযাত্রীর কাছে ছিল, সে ঐ দাঁতটা লকেট করে গলায় ঝুলিয়ে রাখত। দু বছর আগে ঠিক এই জায়গায় সেই কেইন শিপটন অদৃশ্য হয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ তো, বৃষ্টি থেমেছে কি না।"

সন্তু গম্বুজের লোহার দরজাটা খুলে বাইরে উঁকি মারল।

এখানে এই এক অদ্ভুত। যখন-তখন বৃষ্টি, আবার একটু পরেই ঝকমকে রোদ। দুপুরে এমন বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল, আর থামবেই না সারাদিন। কিন্তু এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ফটফটে নীল।

কাকাবাবু উঠে এসে বললেন, "চল, একটু ঘুরে আসি।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে এই বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা খুব বিপজ্জনক। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছড়ানো থাকলে তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু এক-এক জায়গায় বরফ পাথরের মতন শক্ত আর সেখানেই পা পিছলে যায়।

একটা তাঁবুর দড়ির ওপর আলতো ভাবে বসে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছিল মিংমা। ওদের দেখে সে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, "কিধার যাতা, সাব?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, আকাশ পরিষ্কার আছে, কালাপাথর পর্যন্ত গিয়ে দেখি যদি এভারেস্ট দেখা যায়।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে মিংমা বলল, "সন্তু সাব, গ্লাভস কাঁহা? গ্লাভস পরে আসুন। সন্ঝে হলেই বহুত শীত লাগবে!"

সত্যিই তো, সন্তু মনের ভুলে খালি হাতে চলে এসেছিল। শীত তো লাগবেই। তা ছাড়া, মাঝে-মাঝেই আছাড় খেয়ে পড়তে হয়, বরফে হাত লাগে। কাকাবাবু আগেই সাবধান করে দিয়েছেন, বেশি ঠান্ডার মধ্যে খালি হাতে বরফ ছুঁলে ফ্রস্ট বাইট হতে পারে। বরফ কামড়ায়। তাতে অনেক সময় হয়তো আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়।

সন্তু গম্বুজে ফিরে গিয়ে গ্লাভ্স পরে এল।

চতুর্দিক বরফে সাদা হয়ে গেছে। মিংমা আর কাকাবাবু এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। বরফের ওপর দিয়ে দৌড়োবার উপায় নেই। সন্তু বকের মতন লম্বা-লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল ওদের কাছে।

কাকাবাবু শেরপা মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি কেইন শিপটনের নাম শুনেছ?"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব্, সবকোই জানে শিপটন সাবের কথা। হাম দেখা হায় উনকো। ইত্না তাগড়া জোয়ান, মুখ্মে দাড়ি আর মোচ্। আহা বেচারা মর্ গিয়া।"

"তুমি শিপটন সাহেবের দলের সঙ্গে এসেছিলে নাকি?"

"না, সাব। উস্ টাইম আমার বুখার হয়েছিল। পেট মে বহুত দুরদ্!"

"তোমার চেনা কেউ এসেছিল শিপটনের সঙ্গে? নোরবু এসেছিল?"

"না, সাব, নরবু ভি আসেনি। লেকিন আমার দোস্ত্ শেরিং আয়া থা!"

"শিপটন কী করে মারা গেলেন, তুমি শুনেছ?"

"হাঁ, সাব। সবাই জানে। এহি তো জায়গামে ছিল উনাদের বেস্ ক্যাম্প। শিপটন সাবকে দেখে সবাই ভেবেছিল, এ সাব ঠিক এভারেস্ট পীক-এ উঠে যাবে। ইতনা থা উনকা তন্দুরুস্তি।"

"মারা গেলেন কী ভাবে?"

"ব্যাস, বিলকুল বদ্ নসিব। বহুত হিম্মত আর সাহস ছিল তো, তাই একেলা একেলা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। পাহাড়মে এহি কানুন হায় সাব, কোথাও কেউ একেলা যাবে না। একেলা যানেসেই ভয়। দু-জন যাও, কুছ

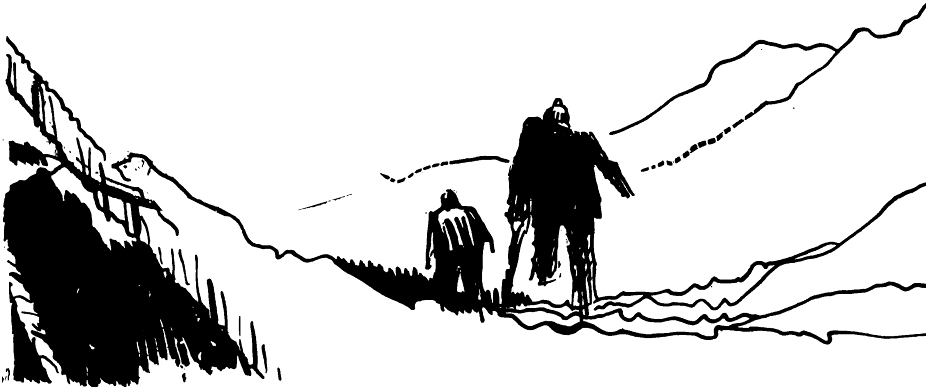

না হোবে। শিপটন সাব সে-কথা মানেননি। একেলা গেলেন, তারপর কোথায় বরফ তাঁকে টেনে নিল!''

''তাঁর দেহটাও তো পাওয়া যায়নি।''

''নেহি মিলা। গরমিণ্টের লোক এসে কত ঢ‌ুঁড়ল। আম্রিকা থেকে ভি আউর বহ‌ুত সাহাবলোক এসে ঢ‌ুঁড়ল। তব‌ু মিলল না। শিপটন সাব সির্ফ বরফকা অন্দর গায়েব হো গিয়া।''

''কিন্তু মিংমা, এই বেস ক্যাম্প থেকে একজন লোক একা-একা হে'টে আর কত দ‌ূর যেতে পারে? বেশি দ‌ূর তো যাবে না। এর মধ্যে কেউ কোনো খাদে পড়ে গেলে তার দেহ পাওয়া যাবে না কেন? খ‌ুব বড় খাদ তো এখানে নেই।''

''কভি কভি এইসা হোতা হ্যায় সাব, বরফ মান‌ুষকো অন্দর টান লেতা হ্যায়। হাঁ সাব, বরফ মান‌ুষকে টেনে নেয়।''

সন্তু বলল, ''ক্রিভাস!''

কাকাবাব‌ু সন্তুর দিকে তাকালেন। সন্তুকে তিনি যতটা ছোট মনে করেন, সে তো ততটা ছোট নয়, সে অনেক কিছ‌ু জানে।

সন্তু অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে কথাটা শিখেছে। সে বলল, "বরফের মধ্যে মাঝে-মাঝে ক্রিভাস্ গর্ত থাকে, তার মধ্যে পা ফস্কে পড়ে গেলেই একেবারে ম‌ৃত্যু।''

কাকাবাব‌ু বললেন, "ঠিকই বলেছিস, কিন্তু কথাটা ক্রিভাস্ নয়। ফরাসিতে বলে ক্রভাস, আর ইংরেজিতে বলে ক্রেভিস। তুই দ‌ুটো মিলিয়ে একটা বাঙালি উচ্চারণ করে ফেলেছিস।''

মিংমাও ক্রেভিস কথাটা জানে। সাহেবদের কাছ থেকে শ‌ুনে শ‌ুনে শিখেছে। সে বলল, "না সাব, ইধার ক্রেভিস নেহি হ্যায়। আরও দ‌ূরে আছে। লেকিন বরফ মান‌ুষকে টেনে নেয়, ইয়ে সাচ বাত হ্যায়।"

কাকাবাব‌ু জিজ্ঞেস করলেন, "এ-রকম ভাবে আরও লোক মরেছে? যাদের ম‌ৃতদেহ পাওয়া যায়নি?"

"হর এক্সপিডিশানেই তো একজন দ‌ু'জন আদমি মরে। কখনো লাশ পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না! শেরপা মরে, কুলি মরে, সাহাব লোক ভি মরে! গত বরষমে আমিও তো একবার মরতে মরতে বাঁচ গিয়া!"

সন্তু বলল, "এত বিপদ, তব‌ু তোমরা এখানে আসো কেন?"

মিংমা গর্বের সঙ্গে বলল, "আমরা পাহাড়ি মান‌ুষ। আমরা বিছানায় শ‌ুয়ে মরতে চাই না। বিছানায় শ‌ুয়ে মরে ডরপ‌ুক আর জেনানারা। আমরা পাহাড়মে, নেহি তো বরফের মধ্যে মরতে চাই। বরফমে মরো, শান্তি, বহ‌ুত শান্তি!''

মিংমা ব‌ুকের ওপর আড়াআড়িভাবে দ‌ুটো হাত রাখল, যেন এর মধ্যেই সে মরে গেছে।

কাকাবাব‌ু হাসি ম‌ুখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

তারপর আবার হাঁটতে শ‌ুর‌ু করে বললেন, "আমরা যেমন বিকেল বেলা বেরিয়েছি, কেইন শিপটনও বেরিয়েছিল বিকেলে। বিকেলবেলা বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সে আর কতদ‌ূর যাবে? যতই সাহসী হোক অভিযাত্রী হিসেবে শিপটন নিশ্চয়ই

এটুকু জানত যে, রাত্তিরবেলা তাঁবুর বাইরে থাকতে নেই। সুতরাং সে সন্ধের আগেই ফিরে আসবার কথা চিন্তা করেছিল নিশ্চয়ই। শিপটনের সঙ্গের লোকেরা বলেছে যে, পর পর তিন দিন শিপটন এইরকম বিকেলবেলা একা-একা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একদিন সে তাঁবুতে ফিরে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল তার দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। তারা কেউ বিশ্বাস করেনি। শিপটনের এমনি বানিয়ে-বানিয়ে মজার কথা বলার অভ্যেস ছিল।"

মিংমা বলল, "হাঁ, শিপটন সাব বহুত জলি আদমি থা। আমার দোস্ত শেরিং বলে যে, শিপটন সাব এমন কথা বলতেন যে, হাঁসতে হাঁসতে পেটমে বেথা হয়ে যেত!"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিপটনের একটা ডায়েরি পাওয়া গেছে। তাতেও সে বানিয়ে-বানিয়ে ঐ রকম কোনো মজার কথা লিখেছে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ডায়েরিতে সাধারণত কেউ মিথ্যে কথা লেখে না। অথচ সে যা লিখেছে, তাও বিশ্বাস করা যায় না!"

"শিপটন কী লিখেছিলেন, কাকাবাবু?"

কাকাবাবু তক্ষুনি সন্তুর কথার উত্তর না দিয়ে মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতবার এক্সপিডিশানে এসেছ, মিংমা?"

মিংমা মুচকি হেসে বলল, "সওয়া সাতবার, আংকেল সাব।"

"সওয়া সাতবার মানে?"

"এহি বার তো আধা ভি নেহি হুয়া, সিকি হুয়া।"

"ও, বুঝেছি। তা এতবার যে তুমি এসেছ, কখনো এইদিকে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ? ধরো ইয়েতি কিংবা বড় ভাল্লুক কিংবা কোনো দৈত্য-দানো?"

"নেহি সাব! কভি নেহি!"

"তোমার চেনাশুনো কেউ দেখেছে?"

"কভি তো শুনা নেহি!"

"তুমি তেনজিং নোরকের নাম জানো?"

মিংমা অমনি সেলামের ভঙ্গিতে কপালে এক হাত ছুঁইয়ে বলল, "জরুর। শেরপা লোগকো গুরু হ্যায়, তেনজিং!"

"সেই তেনজিং নোরকে আমায় বলেছেন যে, তাঁর বিশ্বাস ইয়েতি বলে একরকম মানুষের মতন প্রাণী সত্যিই আছে। কর্নেল হাণ্টও সেই কথা বলেন। অবশ্য স্যার এডমণ্ড হিলারি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। তা তোমরা কেউ ইয়েতির কথা জানো না কিংবা মানো না?"

মিংমার মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল। সে কোনো উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"এদিকে এতবার অভিযাত্রীরা এসেছে, কেউ কিছু দেখেনি?"

"সাব, একঠো বাত বলব!"

"বলো।"

"সাব, আপ ইয়েতি ঢুঁড়তে এসেছেন, এ-কথা যদি জেনে যায়, তবে কুলি লোগ সব ভেগে যাবে। ইয়েতি কেউ দেখেনি, তবু সবাই ইয়েতির নাম দেবতা মাফিক ভয় করে, ভক্তি ভি করে!"

"তাই নাকি? তুমিও ভেগে যাবে না তো?"

মিংমা নিজের বুকে চাপড় মেরে বলল, "নেহি সাব। মিংমা কভি ডরতা নেই! কিসিকো ডরতা নেই!"

"বাঃ, ভাল কথা। আমি অবশ্য ইয়েতি খুঁজতে আসিনি।"

এর পর স্বভাব-গম্ভীর কাকাবাবু খানিকটা যেন ঠাট্টার সুরে বললেন, "ইয়েতি খোঁজা কি আমার কাজ? আমি খোঁড়া মানুষ, ইয়েতি তাড়া করলে কি আমি পালাতে পারব? আমি এসেছি এভারেস্টে উঠতে।"

যেন ইয়েতির তাড়া খেয়ে পালানোর চেয়ে এভারেস্টে ওঠা অনেক সহজ কাজ! কথাটা বলে কাকাবাবু আপন মনে হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু—"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ শিপটনের ডায়েরিতে কী লেখা ছিল, সেটা জানতে চাইছিস তো? বলছি। শিপটন লিখেছে যে, ঐ যে সামনে কালাপাথর নামে ছোট পাহাড়টা, ওর কাছে একদিন সন্ধের মুখে-মুখে ও একজন মানুষকে দেখেছিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষটি শিপটনের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, ঠিক কোদালের ফলার মতন তার দাঁত। অর্থাৎ মনে কর, একজন ঘটোৎকচের মতন মানুষ।"

"তারপর?"

"সেই মানুষটি শিপটনকে দেখে তেড়েও আসেনি, কাঁচা খেয়েও ফেলেনি, আবার পালিয়েও যায়নি। সে শুধু শিপটনের দিকে একবার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, তার পরের মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।"

"অ্যাঁ?"

"শিপটন সেই কথাই লিখেছে। তার চোখের সামনেই লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শিপটন বোধহয় একটা রূপকথা বলতে চেয়েছিল। ইয়েতি সম্বন্ধে যে অনেক রকম গল্প আছে, তার মধ্যে একটা আজগুবি গল্প হচ্ছে, ইয়েতিরা নাকি বরফের তলায় একরকম ঘাসের মতন গাছ জন্মায়, সেইগুলো খুঁজে-খুঁজে খায়। আর তার গুণে যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।"

মিংমা হো-হো হা-হা করে হাসতে লাগল। যেন সে হাসির তোড়ে মাটিতে লুটোপুটি খাবে!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এত হাসছ কেন?'

মিংমা বলল, "কেয়া তাজ্জব কি বাত! ইয়েতিরা ঘাস খায় আর তারপরেই ভ্যানিশ হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠলে অনেকেই চোখে নানা রকম ভুল দেখে। অনেক অভিযাত্রীই এ-কথা লিখেছেন। গভীর সমুদ্রে যারা একা-একা বোট নিয়ে পাড়ি দেয়, তারাও নাকি দেখেছে যে, জল থেকে বিরাট চেহারার কোনো মানুষ উঠে আসছে। এ অনেকটা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতন।"

মিংমা আবার হাসতে হাসতে বলল, "ঘাস খেয়ে ভ্যানিশ। হে-হে হা-হা!"

কাকাবাবু বললেন, "শিপটন ঐ কথা ডায়েরিতে লিখেছে, তারপর সে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। তা হলে কি সে-ও ঐ ঘাস খুঁজে পেয়ে খেয়ে দেখেছিল?"

মিংমা এই কথাতেও হাসতে লাগল। শেরপারা একবার হাসতে শুরু করলে আর সহজে থামতেই চায় না।

এই সময় সন্তু একটা জিনিস দেখতে পেল। ডান দিকে পনেরো-কুড়ি গজ দূরে একটা ছোট্ট সবুজ চারা গাছ, তাতে একটি সাদা রঙের ফুল ফুটে আছে। এখানে আশে-পাশে কোনো গাছ নেই। হঠাৎ বরফের মধ্যে একটা ফুলগাছ এল কী করে?

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল, এইটাই বোধহয় বরফের মধ্যে সেই ঘাসের মতন গাছ, যা খেয়ে ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

বরফের মধ্যে যে দৌড়োতে নেই, সে-কথা ভুলে গিয়ে সন্তু গাছটার দিকে দৌড়োল। কাকাবাবু আর মিংমা সামনের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন কথা বলতে বলতে।

সন্তু প্রায় গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে হোঁচট খেয়ে পড়ল।।একটা হাত পড়ল গাছটার ওপরেই। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কান্ড হল।

ঠিক যেন কোনো গর্তের ওপর আলগা বরফ বিছানো, সন্তুর মাথাটা ঢুকে গেল বরফের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম ভাবে নেমে যেতে লাগল নীচের দিকে। সেই অবস্থায় চ্যাঁচাবার উপায় নেই। তার পা দুটো ছটফট করতে লাগল ওপরে।

কাকাবাবু আর মিংমা কিছুই দেখতে পেলেন না, তখনও তাঁরা কথাবার্তায় মগ্ন।

(ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
ওই তো দর্শকরা হুড়মুড় করে মাঠে ঢুকছে!
থামিয়ে দিয়ে এনলার্জ করুন! তাহলেই ধরা পড়বে, ওরা আমাদের সমর্থক নয়!
তাই কি?
কিন্তু
এ কী! প্রত্যেকের গলাতেই যে····
মেলচেস্টারের স্কার্ফ!
মহা উত্তেজনা···
কী বলবে এখন রয়?
কী বলবে?
বেশ, তোমাদের কথাই····
মেনে নিচ্ছি। আমাদের সমর্থকরাই গণ্ডগোল শুরু করেছিল। কিন্তু···
এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দরকার হলে, আমি নিজেই এর মোকাবিলা করব! পুলিসের দরকার নেই!
মোকাবিলা করবে কী ভাবে?
খেলা দেখতে আসুন। তবেই বুঝবেন।
প্রোজেকশন-রুম থেকে বেরিয়ে রয় বাড়ি চলে গেল····
রয় এবারে বড্ড ধাক্কা খেয়েছে!
খাবারই কথা।

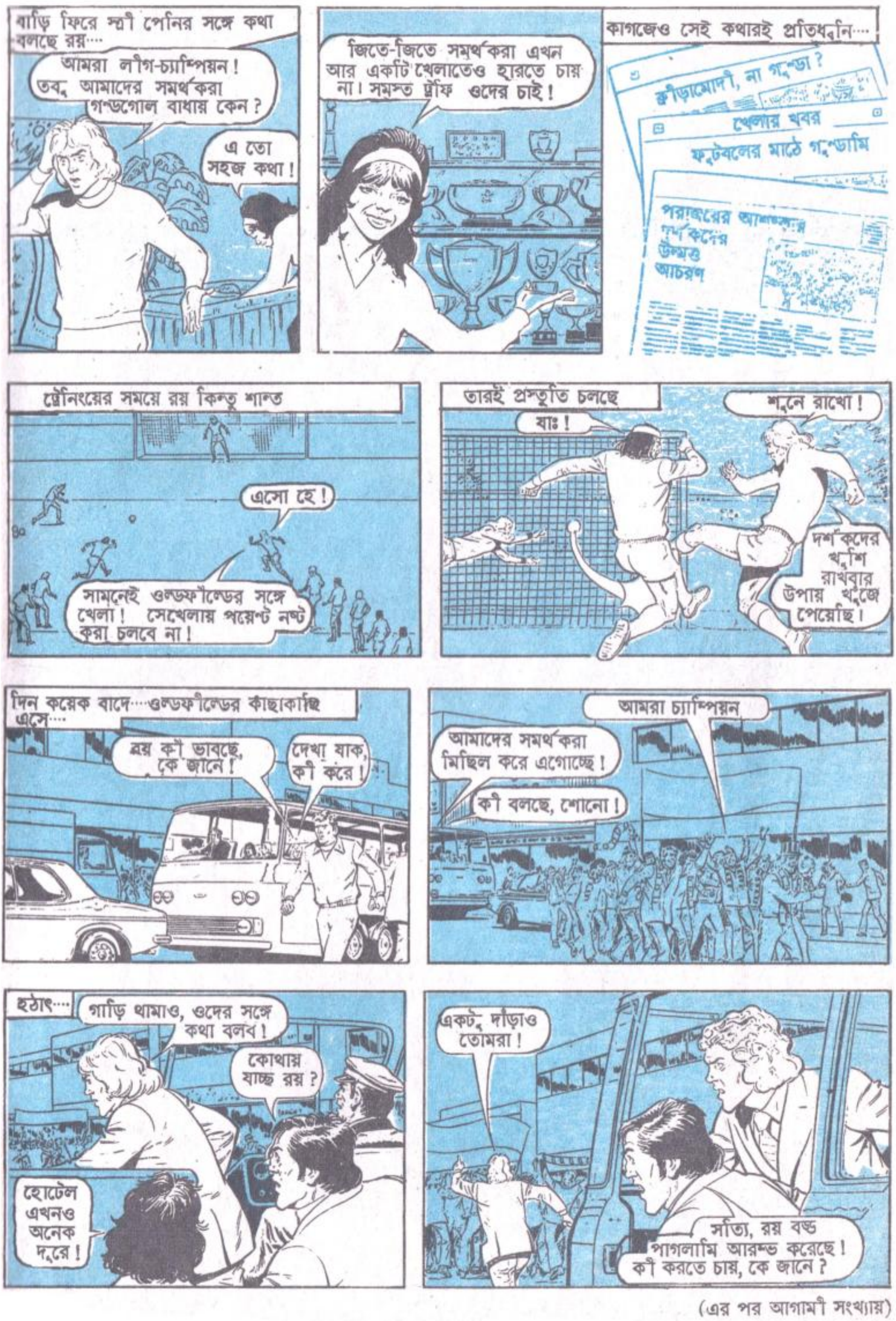

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

দুম!
আরে, মমিটা কোথায় ?
মমি উধাও ! শুধু গয়নাগুলো পড়ে আছে !
কী ব্যাপার অধ্যাপক ?
বাকিটা পড়ুন ! কী জানি !
''ঈশ্বরের আগুনে স্নান করে পবিত্র হবেন রাসকার কাপাক ! নাস্তিকেরা সেদিন শাস্তি পাবে !''
শোনো হারকিউলিস ···
ভবিষ্যদ্বাণী ··· মমি উধাও ··· আমার শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে !
গন্ধ কিসের ? গন্ধকের না ?
ভয় পাবেন না ! আপনি কোথায় ঘুমোন ?
পাশের ঘরে ··· সেখানে জানলা নেই !
তবে আর ভয় কিসের ? ঘরের বাইরে দুজন পুলিস পাহারা দেবে !
চলুন, আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিই !
ঘণ্টা কয়েক বাদে ···

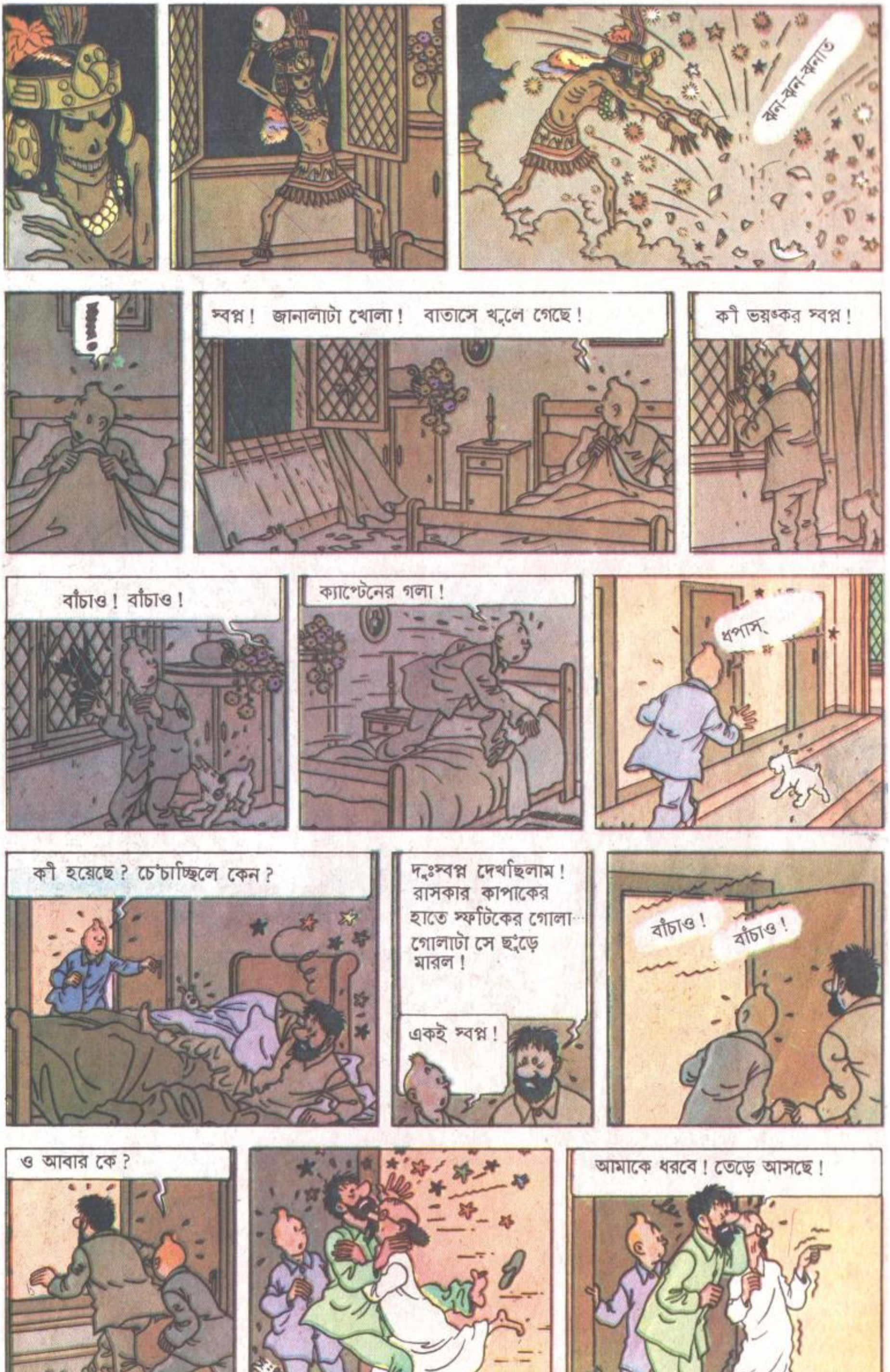

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

ঘোড়ায়-চড়া বর

অরুণ সরকার

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল সে
মাথায় দিয়ে টোপর ;
হঠাৎ ঘোড়া পড়ল বসে
ট্রাম-রাস্তার ওপর।

সে বল্‌ল, "আজ আমার বিয়ে,
বসে পড়ার সময় কি এ ?
ওঠ্ ঘোড়া ওঠ্ লক্ষ্মী সোনা।"
ঘোড়া বল্‌ল, "আর যাব না,
চারদিকেতে রাস্তা খোঁড়া ;
আমি ছিলাম রেসের ঘোড়া,
পা মচ্‌কিয়ে এখন কাবু।
বিয়ে করতে যাচ্ছ বাবু,
ডাকো একটা ট্যাক্সি গাড়ি,
তাই চড়ে যাও শ্বশুরবাড়ি।"

সে বল্‌ল, "ওসব তো জানি,
আমি যে বর রাজস্থানী,
ঘোড়ায় চড়ে যেতেই হবে।"
ঘোড়া বল্‌ল, "একটা তবে
লরি কিম্বা টেম্পো ডাকো,
তুমি আমার পিঠেই থাকো,
লরির পিঠে আমি দাঁড়াই,
চাইবে কিছু বেশি ভাড়াই,
চাইবেই তো, তোমার বিয়ে,
মিটিয়ে দিও পৌঁছে গিয়ে।"

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর মাতৃহারা ছেলে জ্যোতি পার্কে হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত পার্কের মালির কাছে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে নামহীন এক ভদ্রলোক জানাচ্ছেন, জ্যোতিকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে যেন পুলিসে খবর দেওয়া না হয়। তারপর—

॥ ৩ ॥

জয়রাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর পকেট থেকে চশমাটা বার করে চিঠিটা আর একবার ভাল করে পড়লেন। আশ্চর্য তো, জ্যোতিকে চুরি করেছে আবার চিঠিও লিখে রেখে গেছে। এমন তো হয় না।

তারপর বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন, ''তোমার কী মনে হয় বলো তো বিনয়? লোকটা এ চিঠি লিখতে গেল কেন? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। এ কী-রকম ছেলে-চোর?''

বিনয় বললে, ''আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে আমাদের পুলিসকে খবর দেওয়া ভাল।"

জয়রামবাবু বললেন, ''তা তো খবর দিতেই হবে! কিন্তু আমার মনে হয় পার্কের মালিটাকে আর একবার জিজ্ঞেস করা উচিত।''

বিনয় বললে, ''তাহলে চলুন, আর একবার মালিটার কাছে যাই। তখন তাড়াতাড়িতে তাকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। শুধু চিঠিটা নিয়েই চলে এসেছিলুম আপনাকে দেখাবার জন্যে। আপনি তখন খুব ভাবছেন, তাই।''

''তা তাই-ই চলো।''

বলে জয়রামবাবু ফতুয়ার ওপর একটা পাঞ্জাবি পরে নিলেন। তারপর চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে রাস্তায় নামলেন। গোপালও সংগে রইল।

পার্কের পশ্চিম-উত্তর কোণে মালিদের থাকবার ঘর। সেখানে তারা রান্না করে, খায়, শোয়। মালি একজন নয়, দু-তিনজন। তারা কলকাতা কর্পোরেশন থেকে মাইনে পায় আর পার্কের গাছপালা দেখে, সব-কিছু পরিষ্কার রাখে। বিনয় সকলের আগে ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে মালিকে ডাকলে, "ওহে, শোনো এদিকে, তোমার নাম কী?"

মালি তখন তার নিজের রান্নার যোগাড় করছিল। ডাক শুনে এসে বলল, "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ, তোমার নামটা কী বলো তো?"

''আজ্ঞে, আমার নাম যুধিষ্ঠির মহাপাত্র—''

বিনয় জিজ্ঞেস করলে, "তোমাকে এ-চিঠিটা কে দিয়েছে বলতে পারো?"

চিঠিটা দেখে যুধিষ্ঠির বললে, ''আজ্ঞে, তাঁর নাম তো জানি না।"

"কী-রকম দেখতে?"

যুধিষ্ঠির বললে, ''অত ভাল করে তো দেখিনি হুজুর, তখন আকাশের আলো ঝাপসা হয়ে আসছিল। আমি বাগানে ছেলেদের খেলা দেখছিলুম। এমন সময়ে তিনি এসে আমাকে এই চিঠিটা দিলেন।"

"কী-রকম দেখতে তাই বলো না তুমি! মনে আছে তার চেহারাটা?"

যুধিষ্ঠির জয়রামবাবুর দিকে চেয়ে বললে, "এইরকম চেহারা অনেকটা—"

জয়রামবাবু বললেন, "সে কী? আমার মতন চেহারা?"

যুধিষ্ঠির একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর জয়রামবাবুকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, "আজ্ঞে ঠিক আপনার মতো নয়, আপনার চেয়ে অনেক ছোট। আপনার মতো পাঞ্জাবি-পরা, আর ধুতি, আর হাতে একটা ব্যাগ।"

"তিনি চিঠিটা দিয়ে কী বললেন তোমাকে?"

যুধিষ্ঠির বললে, "আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি এই পার্কের মালি কিনা। আমি যখন বললুম যে হ্যাঁ, আমিই এই পার্কের একজন মালি, তখন তিনি বললেন যে এই চিঠিটা তুমি রাখো, যদি কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তো চিঠিটা তাকে দেবে—"

"তিনি একলা ছিলেন, না সংগে আর কেউ ছিল?"

যুধিষ্ঠির বললে, "সংগে একটা ছোট্ট ছেলে ছিল।"

"তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে না তিনি কে?"

যুধিষ্ঠির বললে, "না আজ্ঞে, তা আমি জিজ্ঞেস করিনি!"

"কেন জিজ্ঞেস করোনি?"

যুধিষ্ঠির বললে, ''পার্কে কত বাবুর সঙ্গে কত ছেলেমেয়ে বেড়াতে আসে, আমি কাউকেই তাদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করি না।"

"তা তোমাকে যখন চিঠিটা তিনি দিলেন, তখনও তোমার কিছু সন্দেহ হল না?"

"না বাবু। আমি সন্দেহ করতে যাব কেন? তিনি চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন আর আমিও এই চিঠিটা ভাঁজ করে আমার ট্যাঁকে গুঁজে রাখলুম।"

জয়রামবাবু গোপালের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আর একে দেখতে পাওনি তুমি, এই একে? এই আমার চাকর গোপালকে?"

যুধিষ্ঠির গোপালের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। তারপর বললে, "হ্যাঁ হুজুর, একে আমি চিনি, এ আমার মুখচেনা। কিন্তু তখন এ সেখানে ছিল কি না আমার মনে নেই—''

জয়রামবাবু গোপালকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "কী রে ব্যাটা, এত কান্ড ঘটে গেল খোকাবাবুকে নিয়ে আর তুই কিছুই দেখতে পেলি না? তুই কোথায় কার সঙ্গে আড্ডা মারছিলি?'

গোপাল বললে, "না বাবু, আমি তো খোকাবাবুর সঙ্গেই ছিলুম সব সময়ে।"

"ব্যাটা মিথ্যেবাদী কোথাকার। তোকে মাইনে দিয়ে পুষে এই তো আমার লাভ হল। তোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নুন মাখিয়ে দিলে তবে আমার গায়ের ঝাল মেটে! চল্ ব্যাটা, এখন থানায় চল—সেখানে গেলে মজা টের পাবি, চল—"

বলে সবাই মিলে থানায় গেলেন। থানা বেশি দূরে নয়। থানার দারোগা জয়রামবাবুকে চিনতেন। তাঁকে দেখেই বললেন, "কী খবর চাটুজ্যেমশাই, কী হল? আগে বসুন—''

দারোগাবাবুকে সমস্তই বললেন জয়রামবাবু। একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে সমস্ত।

দারোগাবাবু সব শুনে বললেন "আর সেই মালিটা? সে কোথায়?"

"আজ্ঞে তাকে তো আনিনি!"

"তা থাক, তাকে আমি আনাবার ব্যবস্থা করছি। তবে আপনার এই গোপালকে আমি আটকে রাখছি। আর আপনার ওই চিঠিটা আমার কাছে রেখে যান। ওটা আমাদের কাজে লাগবে!"

বলে একজন কনস্টেবলকে ডাকলেন, "ডিউটি!"

যে পুলিসটা বন্দুক নিয়ে দারোগাবাবুর দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছিল সে দারোগাবাবুর সামনে এসে পায়ে পা লাগিয়ে শব্দ করে হাত তুলে সেলাম করলে, "হুজৌর!"

দারোগাবাবু তাকে হুকুম দিলেন পার্কের যুধিষ্ঠির নামে যে মালি আছে তাকে ধরে নিয়ে আসতে। ডিউটি আবার একবার সেলাম করে চলে গেল।

তারপর দারোগাবাবু গোপালের দিকে চেয়ে বললেন, "তুই কোথায় যাচ্ছিস? তুই থাক এখেনে, তোকে এখানে আটক থাকতে হবে—বাড়ি যেতে পারবি না তুই।"

দারোগাবাবুর কথা শুনে গোপাল হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

দারোগাবাবু জয়রামবাবুদের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনারা বাড়ি চলে যান, আমি ডায়েরি লিখে নিচ্ছি—"

জয়রামবাবু বিনয়ের দিকে চাইলেন। বললেন, "চলো মাস্টার, চলো।"

হাওড়া স্টেশনের ভেতরে একটা হোটেলে টেবিলের সামনে বসে জ্যোতিষ্ক তখন কাটলেট খাচ্ছিল। তার খুব খিদে পেয়েছিল তখন। কাটলেটটা শেষ করতেই পাশের ভদ্রলোক বললেন, "আর কিছু খাবে তুমি জ্যোতি?"

জ্যোতি বললে, "খাব।"

ভদ্রলোক বললেন, ''চপ খাবে?''

''খাব, কিন্তু চপ মানে কী কাকাবাবু?''

ভদ্রলোক মহা মুশকিলে পড়লেন। বললেন, "একটা খাবারের নাম!"

জ্যোতি বললে, "কাটলেট একটা খাবারের নাম, আবার চপ মানেও একটা খাবারের নাম?"

ভদ্রলোক বললেন, ''হ্যাঁ।''

তারপর তিনি বয়কে বলে দিলেন একটা চপ দিতে।

জ্যোতির প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি। বললে, "আচ্ছা কাকাবাবু, খাবারের নাম কে দিলে? কারা দিলে?"

ভদ্রলোক বললেন, ''কে আবার নাম দেবে, মানুষরাই নাম দিলে!"

"মানুষরা কেন ও-নাম দিলে? অন্য নাম দিলে না কেন?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে গেলেন। বললেন, তোমার কথার জ্বালায় আমি তো অস্থির হয়ে যাব দেখছি। সব জিনিস তোমার জানতে ইচ্ছে করে?"

জ্যোতি কিন্তু তখনও খুশি হয়নি। বললে, "আপনি বলুন না কাকাবাবু, চপ-কাটলেট-কাবাব এ-সব নাম কেন দিলে মানুষ? আর অন্য কিছু নাম খুঁজে পেলে না?"

ভদ্রলোক উলটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, "তোমার নাম যে জ্যোতিষ্ক, ও-নাম তোমার কে দিয়েছে?"

জ্যোতি বললে, "বা রে, এ তো সোজা কথা। আমি তো বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার জ্যোতিষ্ক নাম কে দিলে? বাবা বলেছিলেন তিনি নামটা দিয়েছেন।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "তা আমার নাম কী বলো তো?"

জ্যোতি বললে, "বা রে, আপনার নাম তো কাকাবাবু!"

"না, হল না। কাকাবাবু কখনও নাম হয়? আমার নাম চন্দ্রভানু চট্টোপাধ্যায়।"

জ্যোতি বললে, "তাহলে আমি কী নামে ডাকব আপনাকে? চন্দ্রভানু চট্টোপাধ্যায় বলে?"

"না, আমি তো শিখিয়ে দিয়েছি তোমাকে। আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকবে। তোমার বাবাকে যে তুমি বাবা বলে ডাকো, তা বাবার আসল নাম কী বলো তো?"

"আমার বাবার আসল নাম তো বাবা?"

"না, হল না, তোমার বাবার আসল নাম জয়রাম চট্টোপাধ্যায়!"

জ্যোতির হঠাৎ যেন কী-কথা মনে পড়ে গেল। বললে, "কই, আপনি যে আমাকে রেলগাড়ি চড়াবেন বলেছিলেন, কখন চড়াবেন রেলগাড়ি?"

ততক্ষণে চপ এসে গিয়েছিল। জ্যোতি চপটা কামড়ে খেতে লাগল। চন্দ্রভানুবাবু একদৃষ্টে জ্যোতির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। কী ফটফুটে ছেলেটা! আর কী বুদ্ধি। কলকাতার একটা পার্কে একে খেলতে দেখেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলেন তিনি। অনেক ছেলেই তো খেলছে। কিন্তু তারই মধ্যে এই ছেলেটাকেই তাঁর চোখে ধরল। খেলতে খেলতে যেই ছেলেটা রেলিঙের ধারে এসেছে বল কুড়োতে, তিনিও কাছে গিয়ে ডাকলেন, "এই খোকা—খোকা, শোন—"

ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, "আমার নাম তো খোকা নয়, আমার নাম তো জ্যোতি—"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি জ্যোতি, তোমার বাবার নাম কী?"

জ্যোতি বলেছিল, "আমার বাবার নাম বাবা—"

"তুমি রেলগাড়ি চড়বে?"

জ্যোতি বললে, "আমাকে আপনি রেলগাড়ি চড়াবেন?"

"হ্যাঁ, তোমাকে আমি রেলগাড়ি চড়াব। তোমার বল-খেলা আগে শেষ হোক!"

জ্যোতি তখন আর বেশিক্ষণ বল খেলেনি। তখন তার খেলা মাঝখানেই বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখনই নিজের হাত-ব্যাগ থেকে এক

টুকরো কাগজ বার করে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে ফেললেন। চিঠির ওপরেও নাম লিখলেন না, নীচেও নাম সই করলেন না।

ছেলেটা তখন তাঁর কাছে দৌড়ে এসেছে। বললে, "কই, আমাকে রেলগাড়ি চড়াবেন না?"

চন্দ্রভানুবাবু চিঠিটা তাড়াতাড়ি পার্কের একজন মালির হাতে দিয়ে দিলেন। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়লেন। ট্যাক্সিটা চলতে লাগল শোঁ-শোঁ করে।

জ্যোতির খুব আনন্দ। বললে, "এর নাম বুঝি রেলগাড়ি?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "না, এটার নাম ট্যাক্সি। এই ট্যাক্সি চড়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে যাব, সেখানে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠব।"

তার পরে হাওড়া স্টেশনে এসে তিনি হোটেলে খাওয়াতে ঢুকেছিলেন। ছেলেটার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। নিজেও খেলেন।

ততক্ষণে জ্যোতির খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রভানুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পেট ভরেছে তো?"

"হ্যাঁ।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "এবার তোমার ঘুম পাচ্ছে নিশ্চয়?"

জ্যোতি বললে, "আগে আপনি আমাকে রেলগাড়ি চড়ান। তবে আমি ঘুমোব—"

জীবনে কোনও দিন এ-সব জায়গায় আগে আসেনি জ্যোতি। কত লোক, কত আলো, কত দেখবার জিনিস। জীবনে বাড়ি আর পার্ক ছাড়া আর কোনও দিন কোথাও যায়নি সে। বাবা তাকে যেতে দেননি। চারদিক দেখে দেখে তার আর আশ মেটে না। চন্দ্রভানুবাবু একটা জানালার কাছে গিয়ে টিকিট কেটে নিলেন দুজনের। একখানা ফুল, আর একখানা হাফ। জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, "কখন রেলগাড়ি চড়াবেন কাকাবাবু?"

"এইবার চড়াব, চলো—"

গেট পেরিয়ে চন্দ্রভানুবাবু চলতে লাগলেন আরো ভেতরের দিকে। বলতে লাগলেন, "এই দ্যাখো, এইটে হল রেলগাড়ি, আমরা এই গাড়িতে উঠব। এই রেলগাড়ি গড়গড় করে চলবে—"

জ্যোতি দেখতে লাগল রেলগাড়িটার দিকে। কত লোক গাড়ির ভেতরে বসে আছে। বললে, "উঠুন কাকাবাবু, উঠুন—সবাই উঠে বসে গেছে যে—"

একটা গাড়ির দরজা খোলা ছিল। চন্দ্রভানুবাবু সেই গাড়িটার ভেতরে তুলে দিলেন জ্যোতিকে। মাথার ওপরে পাখা, আলো। যেন ঠিক একটা বাড়ি। জিজ্ঞেস করলে, "এটা চলছে না কেন কাকাবাবু?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "এইবার চলতে আরম্ভ করবে, আর একটু অপেক্ষা করো—"

কিন্তু অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে পড়ল জ্যোতি। তারপর আরো দুজন ভদ্রলোক এসে উঠল কামরার ভেতরে। জ্যোতি তাদের দেখে একটু শান্ত হল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই একটা বিকট শব্দ হল।

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "ওই শোনো ইঞ্জিনের শব্দ।"

তারপরে কোথা থেকে একটা বাঁশির শব্দ শোনা গেল। চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "ওই শোনো, রেলগাড়ির গার্ডসাহেব বাঁশি বাজাচ্ছে—"

তারপর আশ্চর্য, রেলগাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে লাগল। প্রথমে খুব আস্তে, তারপর একটু জোরে। তার পরে অনেক জোরে। দু পাশের সব-কিছু উল্টো দিকে ছুটে ছুটে চলতে লাগল।

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, "রেলগাড়ি কত-দূর যাবে কাকাবাবু?"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "অনেক দূর যাবে—"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, "অনেক দূরে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"আকাশে যাবে? যে-আকাশে চাঁদ থাকে, সেখানে যাবে?"

গাড়ির অন্য একজন ভদ্রলোক বললে, "ছেলেটির তো খুব বুদ্ধি!"

চন্দ্রভানুবাবু কিছু জবাব দিলেন না সে-কথার। ট্রেন তখন খুব জোরে জোরে ছুটে চলেছে। জ্যোতির তখন খুব আনন্দ হচ্ছে। সে আকাশে যাবে। আকাশ ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। তারপর সেখান থেকে আরো আরো অনেক দূরে। অনেক অনেক অনেক দূরে। জ্যোতি জানালার বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই অনেক দূরের স্বপ্ন দেখতে লাগল!

ট্রেন তখন রাত্রের অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে। (ক্রমশ)

ছবি অনূপ রায়

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ২৭ ॥

নানা সাফল্যের সুখস্মৃতিতে বাষট্টির ফুটবল মরসুম আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। ওই মরসুমের শেষে শীত পড়তে পড়তেই ভাবছিলুম, ব্যাটে-বলে যখন একটু হাত আছে, তখন আর একটু সিরিয়াস হয়ে ক্রিকেটে হাত পাকাতে চেষ্টা করি না কেন? ঠিক ওই সময়েই ব্যাঙ্কিং প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হায়দরাবাদে স্টেট ব্যাঙ্কের স্টাফ ট্রেনিং কলেজে। দীর্ঘ চার মাসের কোর্স। সুতরাং কলকাতায় ক্রিকেট অনুশীলনের কোনো সম্ভাবনাই রইল না।

কিন্তু একদিক দিয়ে ভালই হল। হায়দরাবাদ মোটেই আমার অপরিচিত জায়গা নয়। অনেকবার খেলতে গিয়েছি। রহিম সাহেবের কোচিং ক্যাম্পে কাটিয়েছি বেশ কিছুদিন। ওখানকার বহু ফুটবলারের সঙ্গে ভাব তো আগে থেকেই জমে উঠেছিল। আমি ক্রিকেট খেলতে ইচ্ছুক এ-কথা জেনে তারাই আমার খেলার ব্যবস্থা করে দিল হায়দরাবাদ ব্লুজ দলে। ওখানকার ক্রিকেট লীগে মোটামুটি ভাল দল। ফুটবলের মতো তখন হায়দরাবাদ ক্রিকেটেও বেশ সমৃদ্ধ ছিল। জয়সীমা, আব্বাস আলি বেগ, আবিদ আলি প্রভৃতিকে নিয়ে ক্রিকেটে হায়দরাবাদ রীতিমত শক্তিশালী। এখন (১৯৭৯) যিনি পাকিস্তানের ক্রিকেট অধিনায়ক, সেই আসিফ ইকবালও তখন হায়দরাবাদের উঠতি ব্যাটসম্যান।

হায়দরাবাদ ব্লুজের পক্ষে আমি নিয়মিত লীগে খেলতে আরম্ভ করলুম। প্রতি সপ্তাহের শেষেই লীগের খেলা থাকত। স্টাফ ট্রেনিং কলেজে যেদিন ক্লাস থাকত না সেদিন করতুম অনুশীলন। লীগের দু’তিনটি খেলার পর সেকেন্দরাবাদ ক্লাবের বিরুদ্ধে একটি সুন্দর সেঞ্চুরি করলুম সারা ইনিংসে একটিও চান্স না দিয়ে। অন্য খেলায় সেঞ্চুরি করতে না পারলেও মোটামুটি ভাল রান পাচ্ছিলুম। পাচ্ছিলুম উইকেটও। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বর্তমান সম্পাদক গোলাম আমেদ একদিন আমার করমর্দন করে বললেন, “আরে তুমি তো বড় ফুটবলার জানতুম। এখন দেখছি, ক্রিকেটেও তোমার দক্ষতা নেহাত কম নয়। তুমি কি ডেনিস কম্পটন হতে চাও?” আমি আর কী বলব। গোলাম আমেদ পরে বললেন, “ক্রিকেট কিন্তু ছেড়ো না। বরং পঙ্কজ রায়ের মতো ফুটবলটা ছেড়ে দিয়ে আরো সিরিয়াসলি ক্রিকেট খেল।”

একদিন স্টাফ ট্রেনিং কলেজের ঠিকানায় আমার নামে এক টেলিগ্রাম এল। পাঠিয়েছেন সি এ বি-র সম্পাদক। তিনি জানতে চেয়েছেন —ইডেনে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাংলা দলে আমি খেলতে পারব কিনা।

টেলিগ্রাম পেয়ে আমি তো অবাক। রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ লীগের খেলা নয়, একেবারে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার প্রথম সুযোগ। ভাবলুম কীভাবে বাংলার নির্বাচকরা জানলেন আমি হায়দরাবাদে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছি! ওখানকার ক্রিকেট লীগের খেলার ফল তো কলকাতার কাগজে প্রকাশ করা হয় না। পরে জেনেছিলুম, গোলাম আমেদই বাংলার ক্রিকেট কর্তাদের কাছে কথাটা বলেছিলেন। এও নাকি বলেছিলেন যে, বাংলা যদি আমাকে দলে না নেয়, তাহলে হায়দরাবাদ আমাকে তাদের দলে রাখবে।

যাই হোক, টেলিগ্রাম পাবার পর আমার আনন্দ যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমন মাথায় এসেছিল নানা চিন্তা। বাঙ্গালোরে তখন চলছিল সন্তোষ ট্রফির খেলা। সন্তোষ ট্রফিতে আমার বাংলা দলে খেলার কথা ছিল। কিন্তু রঞ্জি ট্রফিতে খেললে সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে পারব না। তারপর জাতীয় ক্রিকেটে প্রথম খেলতে নেমে কতখানি সফল হব সে-বিষয়েও সন্দেহ ছিল। ছুটি পাবারও সমস্যা না ছিল এমন নয়।

আমাদের স্টাফ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জেনারেল কে এন ক্যারিয়াপ্পার ভাই কে এম নানজাপ্পা। দারুণ স্ট্রিক্ট। ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসার জো ছিল না। আমি জানতুম ট্রেনিংয়ের সময় ছুটি দেওয়ার কোনো নজির নেই। তবু সাহসে ভর করে

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কিশোর-কাহিনী

● বিশ্বের বিখ্যাত অনেক কিশোর উপন্যাস ● ছোটদের সব রকমের সব স্বাদের সেরা গল্প—ভূতের, হাসির, গোয়েন্দা, অ্যাডভেঞ্চার ● সত্যি শিকার-কাহিনী, ভৌগোলিক অভিযান, ডাকাতির কথা, যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী ● দেশ বিদেশের পৌরাণিক কাহিনী, লোক-গল্প ও রূপকথা ● ঈশপ-ক্রিলভ-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিগল্প, পশুপাখির অন্যান্য গল্প, ● মহাকাব্য ও প্রাচীন কাব্যের গল্প, যেমন—ইলিয়াড, ওডেসি, বিওউলফ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা, শাহনামা, ইগর সাগা, ভারতীয় মহাকাব্যের গল্প, বাই-বেলের গল্প ● সেক্‌সপীয়র ও কালি-দাসের নাটকের গল্প ● আরব্য রজনী ও কথাসরিৎসাগরের কাহিনী।

প্রতি খণ্ডের গ্রাহক-মূল্য ২০ ০০। গ্রাহক-চাঁদা ১০·০০। গ্রাহক-চাঁদা শেষ খণ্ডের মূল্য থেকে বাদ যাবে। এককালীন গ্রাহক-মূল্য ২০০·০০ টাকা। ডাকে বই নিলে আলাদা ডাকমাশুল। এককালীন গ্রাহকের প্রতি খণ্ডের জন্য ৩·০০ টাকা করে ডাকমাশুল। টাকা নিজে এসে, মানি অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে (চেকে নয়) দিতে হবে। প্রতি খণ্ডে প্রায় ৫০টি ছবি—ভালো কাগজ, ভালো বাঁধাই। গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। শেষ তারিখ : ১৫. ৯. ৭৯ ১ম খণ্ড পূজার আগে বেরুবে।

গ্রন্থনিলয়

৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

প্রিন্সিপ্যালের কাছে ছুটি চাইতেই তিনি বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার! তোমার দল ওই সময়ে বাঙ্গালোরে জাতীয় ফুটবলে খেলবে. আর তুমি ছুটি চাইছ ক্রিকেট খেলার জন্য?" আমি বললুম, "স্যার, জাতীয় ফুটবলে তো আমি অনেক খেলেছি। জাতীয় ক্রিকেটে খেলার এই প্রথম সুযোগ। সেটা ছেড়ে দেব কেন?"

কে এম নানাজাপ্পা দারুণ স্ট্রিক্ট হলেও সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান ছিলেন। ছুটি মঞ্জুর করে বললেন, "খেলায় হারই হোক আর জিতই হোক, একদিনও দেরি করো না। খেলার পরেই চলে এসে ক্লাসে যোগ দিও কিন্তু।"

কলকাতায় এসে যে খবর শুনলুম তাতে রীতিমত ঘাবড়ে যাবার কথা। ফাস্ট বলের কোচিংয়ের জন্য ওই বছর ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলারকে প্রশিক্ষক হিসাবে ভারতে এনেছিলেন। চার-জনকে চারটি জোনে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রয় গিলক্রিস্ট প্রশিক্ষণ চালাচ্ছিলেন হায়দরাবাদে, চার্লি স্টেয়ার্স বোম্বাইয়ে, উইলি ওয়াটসন দিল্লিতে এবং লেস্টার কিং বাংলায়। ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যাতে সড়গড় হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ওই চারজন ফাস্ট বোলার যে-রাজ্যে প্রশিক্ষণ চালাচ্ছিলেন সেই রাজ্য-দলের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতেও তাঁদের খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং রয় গিলক্রিস্ট ছিলেন হায়দরাবাদ দলে।

শুনলুম গোলাম আমেদের সুপারিশ বাংলা দলে আমার অন্তর্ভুক্তির আসল কারণ হলেও নির্বাচকদের আর একটি ধারণা ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন হায়দরাবাদে যখন আমি নিয়মিত ক্রিকেট খেলেছি, তখন নিশ্চয়ই দারুণ ফাস্ট বোলার গিলক্রিস্টের বলেরও মোকাবিলা করেছি। আসলে কিন্তু তা নয়। তখনও পর্যন্ত গিলক্রিস্টের বলের বিরুদ্ধে আমি একটি ম্যাচও খেলিনি। তাই ঘাবড়ে যাবার কারণ ছিল বই-কী।

কিন্তু শুধু ঘাবড়ানোই নয়, তেষট্টির তেইশে ফেব্রুয়ারি তারিখে যেদিন ইডেনে খেলা শুরু হয় সেদিন আমরাও আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলুম যখন খেলার আগে তিন-চারটি বল লোফালুফি করতে করতে গিলক্রিস্ট তাঁর সহ-খেলোয়াড়দের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা বলো দেখি, এর মধ্যে কোন্ বলটা

গোলাম আমেদ (এখন)

পঙ্কজ রায়ের মাথা ভাঙতে পারবে?''

এই সেই গিলক্রিস্ট যাঁর কথা শুধু মুখের কথাই নয়, যাঁর কথায় ও কাজে দারুণ মিল। যাঁর অগ্নিমূর্তির সামনে পোড়-খাওয়া টেস্ট ক্রিকেটাররাও শিউরে ওঠেন।

ক্রিকেট-মাঠে গিলক্রিস্টের অভব্যতার এবং অ-ক্রিকেটীয় কাণ্ডের অনেক নজির আছে। মাঠের বাইরেও নজির কম নেই। কিন্তু তিনি কেন পঙ্কজদার মাথা ভাঙতে চেয়েছিলেন জানো? আটান্ন সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফরে এসেছিল তখন গিলক্রিস্টের সঙ্গে বাংলার ক্রিকেট-কর্মকর্তাদের ঝগড়া হয়েছিল। হোটেলে তাঁর অভদ্র ব্যবহার নিয়েও কর্মকর্তাদের অনেক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। তার উপর বাংলা-হায়দরাবাদ কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ওই খেলার উপর একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল কানপুরে।

কাকের বাসা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কাক রে, ওরে কাক,
গলিয়ে যে তোর নাক
এ-ছাদ থেকে দড়ি চুরি
ও-ছাদ থেকে হাতা,
কা-কা ডাকের চিৎকারে তোর
যায় না যে কান পাতা।
আলসেতে এক বাসা গড়িস
তা যেন তুই গড়্,
বাসা গড়তে কী কী লাগে,
কাঠ কুটো আর খড়,
তা না-করে বাসা যে তুই
বানাস জাদুঘর।
হ্যাঙার আছে, চামচ আছে,
আর আছে লাল ফিতে,
মাথা-ভাঙা পুতুলটাকেও
ভুলিসনি তো নিতে।
বাচ্চারা তোর পুতুল নিয়ে
করবে নাকি খেলা?
ডিম ফোটেনি, তারও জোগাড়
করলি যে এই বেলা।
তা নয় হল, কিন্তু যে তোর
খবরদারির জের,
কাছে এলেই ঠুকরে মাথা
পালিয়ে যে যাস্ ফের।
এক দিকে তুই এক দিকে তোর
কাকিনী যেন পুলিস,
কেউ কাছেতে এলেই ভীষণ
সোরগোল যে তুলিস।
কতদিনে দেখি তোদের
ফুটে বেরোয় ছানা,
অবিশ্যি তোর ঠোঁটের ঘায়ে
চোখ না হলে কানা।

ছবি রতন সেন

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	৫
৬		■	৭	■	৮	
	■	৯			■	
■	১০	■		■	১১	■
১২			■	১৩		১৪
১৫		■	১৬	■	১৭	
	■	১৮				

সংকেত : পাশাপাশি : (১) আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ॥ (৩) ক্ষুদ্র জীব। (৬) কোন্ দিকটা উলটো দিক থেকে দেখলে শরীর হয়ে যায়? (৮) যে কোনো-কিছু হবার অপেক্ষায় আছে। (৯) কার জন্মের পর তাঁর বাবা গৃহত্যাগী হয়েছিলেন? (১২) বিখ্যাত বাংলা কাব্যগ্রন্থ। (১৩) চাঁটা খেলেই বোল ফোটে কার? (১৫) পৃথিবীর অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শিল্পাঞ্চল। (১৭) রাত পোহালে পাখি-সব কী করে? (১৮) নৌকোর চলাফেরা - নিয়ন্ত্রক

উপর-নীচ : (১) গোলমরিচ-জাতীয় ফল। (২) স্তুতি। (৪) ধাতু-বিশেষ। (৫) ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশের রাজধানী। (৭) জলচর পাখি॥ (১০) ভারতের একটি বিখ্যাত হ্রদ। (১১) যার আর-এক নাম সন্দেশ॥ (১২) পশ্চিম দিকের অধিদেবতা। (১৪) সৌন্দর্য। (১৬) কোন্ বিদেশী প্রত্যয়ের আর-এক অর্থ পর্বত?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মি	ছ	রি	■	না	র	দ
না	টা	■	অ	■	স	র্প
র	■	ঝি	ল	ম	■	ণ
■	আ	ল	কা	ত	রা	■
শ	স্য	■	তি	■	না	গা
ম্বু	■	শি	ল	ঙ	■	ন্ধা
ক	■	প্রা	কা	র	■	রী

ধাঁধা

রাঙাদাদু নতুন গাড়ি কিনেছে।

কদিন ধরে তাই আমরা গাড়িতে করে খুব ঘুরছি। ছোট্‌কা তো অফিসেই নিয়ে গেল কদিন গাড়িটা।

সেদিন ছোট্‌কা অফিস-ফেরতা গাড়ি থেকে নামতেই আমি চলে এলাম নীচে। উদ্দেশ্য একটাই, ছোট্‌কাকে এবার ধাঁধার কথা বলব। আমার আগেই দেখি রাঙাদাদু নেমে এসেছে।

শুনলাম, রাঙাদাদু আর ছোট্‌কার মধ্যে গাড়ি নিয়েই কথা চলছে। রাঙাদাদু বলছে, "এত তাড়াতাড়ি ফিরলি কী করে?

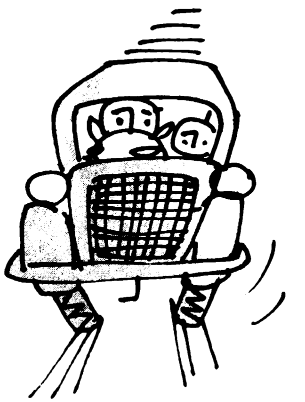

নিশ্চয়ই গাড়ি খুব জোরে চালিয়েছে আজ।"

উত্তরে ছোট্‌কা মজার মুখ করে বলল "না না, মোটেই বেশি জোরে চালায়নি আজ ড্রাইভার। আমি ঠিক সময়েই অফিস থেকে বেরিয়েছি আজ। কাঁটায় কাঁটায়, ঘড়ি ধরে। আর পৌঁছেছিও ঠিক-সময়ে। যদি ঘণ্টায় আরও ছ' মাইল জোরে চলত গাড়িটা—মানে যে স্পীডে রোজ চলে তার চেয়ে ঘণ্টায় আরও ছ' মাইল বেশি স্পীডে চালাত ড্রাইভার, তাহলে আজ পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছে যেতাম। আর যদি অন্য দিনের থেকে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল আস্তে চলত আজ গাড়িটা, তাহলে পৌঁছতাম ছ' মিনিট দেরিতে।"

রাঙাদাদু ফ্যালফ্যাল করে ছোট্‌কার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "তুই এমন হেঁয়ালিতে কথা বলিস, আমি কিছুই বুঝি না।"

ছোট্‌কা ততক্ষণে আমায় দেখতে পেয়ে গেছে। রাঙাদাদুকে বলল, "কথাটা তোমায় বলিনি, বলেছি সতুবাবুকে। কেমন জব্বর ধাঁধাখানা দিলাম॥ এখন বলো তো, কত মাইল ড্রাইভ করে এসেছি আমরা। রোজই বা গাড়িটা কত মাইল স্পীডে যাতায়াত করে?"

আমি পারিনি বলতে॥ তোমরা পারো? এটাই তাহলে এবারের প্রথম ধাঁধা হোক।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ রাস্তায় ২ টাকার নোট কুড়িয়ে পেলেন এক ভদ্রলোক। টাকাটা পকেটে রাখতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর নিজের যদি ২ টাকা হারিয়ে যেত তাহলে যত টাকা থাকত পকেটে, এই কুড়িয়ে-পাওয়া ২ টাকা নিয়ে তার পাঁচ গুণ রইল এখন পকেটে।

ভদ্রলোকের কত টাকা ছিল পকেটে, ২ টাকা কুড়িয়ে পাবার আগে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শূন্য স্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও

১৬(৯৩)১৫

১৪(   )১২

চতুর্থ ধাঁধা ॥ পরের সংখ্যাটা কত হবে?

১ ১২ ২৩ ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) হালদারের স্ত্রীর নাম যূথিকা। দেবী মিস্টার জানার স্ত্রী নন, নন্দীরও নন, তাহলে নিশ্চিত মিস্টার বসুর স্ত্রী। তাহলে, প্রথম সূত্র অনুসারে, নমিতা মিস্টার নন্দীর স্ত্রী, কেননা বাণী বসুর স্ত্রী নন আগেই জানা গেছে। সুতরাং বাণী মিস্টার জানার স্ত্রী॥ (২) কপিঞ্জল —অন্য শব্দগুলি পদ্মের প্রতিশব্দ (৩) ৩×৩+৩/৩ = ১০ (৪) ৬৩ (আগের সংখ্যার বর্গ থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে পরের সংখ্যা তৈরি হয়েছে)

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

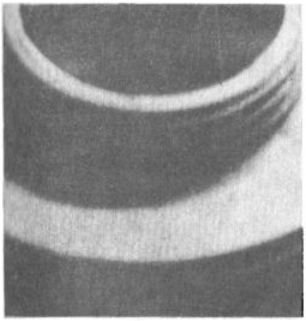

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল এরোপ্লেনের জানালার ছবি   ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ কবিদের আদরের কোন্ পতঙ্গ রাস্তায় বেরুলেই সরু হয়ে যায়?

উঃ অলি, গলির সঙ্গে মিলে অলিগলি।

প্রঃ কোন্ উপগ্রহকে বাংলাভাষীরা ছোট্ট এতটুকু করে ফেলে নাক দিয়ে বার করে?

উঃ চন্দ্রকে। বিন্দু বানিয়ে নাকি স্বরে বলতে হয়।

প্রঃ নৌ-বাহিনীর কোন্ বড় অফিসার সব সময় পিছন দিকে থাকেন?

উঃ Rear Admiral.

প্রঃ পরের দিনের ট্রেন কি একদিন আগে ছেড়ে যেতে পারে?

উঃ কেন পারবে না, কালকা মেল তো আজই ছোড়্তা হ্যায়।

প্রঃ লিফ্টে বেশি লোক চড়ায় সেটা উঠতে পারছিল না। মোটাসোটা কয়েকজন বেরিয়ে এলেও কোনো ফল হল না। তারপর একজন রোগা মতন লোক বেরিয়ে আসতেই লিফ্ট উঠতে শুরু করল। কী করে এমন হল?

উঃ লোকটার মাথায় বিরাট চিন্তার বোঝা ছিল।

সুসেন

মজার খেলা

যতজন খুশি ততজন অংশ নিতে পারে এই খেলাটায়। দারুণ মজার খেলা। পার্টিতে, পিকনিকে জন্মদিনে হই-হল্লোড় পড়ে যাবে এই খেলাটা খেললে।

যারা খেলবে তারা সবাই গোল হয়ে বসবে। প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটা বড় কাগজ আর একটা পেন। প্রত্যেকে নিজের কাগজে একটা গল্প লিখতে শুরু করবে।

গল্পটা শুরু করার পর দু-তিন লাইন মাত্র লিখবে এক-একজন। তারপর থামিয়ে দেবে তুমি। তুমি নিজে এই খেলায় অংশ নিচ্ছ বাইরে থেকে। অর্থাৎ খেলা শুরু আর বন্ধ করা দায়িত্ব তোমার।

যখনি তুমি থামতে বলবে, তখনি প্রত্যেকে থেমে যাবে। প্রত্যেকে তার শুরু করা গল্পটা ভাঁজ করে কাগজটা পাশের লোকের হাতে চালান করে দেবে। আগে কী লেখা হয়েছে কেউ জানত পারবে না। তারপর প্রত্যেকে আবার নতুন-পাওয়া কাগজটায় নতুন করে একটা গল্পের দু-তিনটে লাইন লিখবে। আবার থামিয়ে দেবে তুমি। আবার কাগজ ভাঁজ করে পাশের লোকের

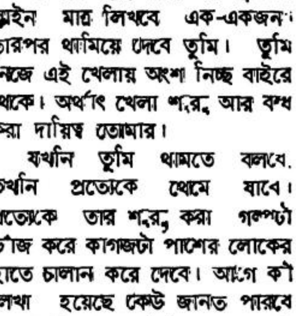

হাতে তুলে দেবে প্রত্যেকে। ফের শুরু হবে গল্প লেখা।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে কাগজগুলো এক জায়গায় জড়ো করে জোরে-জোরে এক-একটা পৃষ্ঠা পড়ে শোনাও। দেখবে কী অদ্ভুত মজাদার গল্প প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। হাসির তুফান তুলবে প্রত্যেকটি পাতা।

মজারু

হাসিখুশি

একটি ছোট ছেলে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, এটা কী ফুল, এটা কি গোলাপ?"

দিদি রেগে গেল, "না না, কী যা-তা বলছ। এটা হল পাহাড়ি ফুল, ক্রিসেনথিমাম।"

ছেলেটি বলল, "দিদি, ক্রিসেনথিমাম বানান কী রে?"

দিদি চেষ্টা করতে লাগল, "ক্ষ য় ক্ষ, না তা হবে না, ক'য় র-ফলা ই-কার, হ্রস্ব ই, না না দীর্ঘ ঈ, দন্ত্য স, না বোধহয় তালব্য শ..." এর পর একটু থেমে দম নিয়ে সে বলল, "না রে, এটা গোলাপ; গ ও-কার, ল আ-কার আর প।"

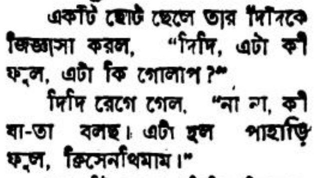

ডাক্তারবাবু চৌধুরীসাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁর ছেলের যখন হামের চিকিৎসা হয়েছিল সেই সময়কার দশ টাকা এখনো পাওনা আছে। যেন অবাক হয়ে গেছেন এই কথা শুনে—চৌধুরী সাহেব বললেন, "সে কী ডাক্তারবাবু, ঐ টাকা চাইছেন?" ডাক্তারবাবু বিচলিত হয়ে বললেন, "কেন, কোনো দোষ হল?" চৌধুরীসাহেব বললেন, "না, কোনো দোষ নয়, তবে আমার ছেলেরই প্রথম হাম হয়, তারপর তার থেকে কত বাচ্চার হয়েছিল। এ বছর হামের মরসুমে আপনি কম উপার্জন করেছেন, ডাক্তারবাবু? আর এখন ঐ সামান্য দশটা টাকা আমার কাছে চাইছেন?"

ছবি অহিভূষণ মালিক

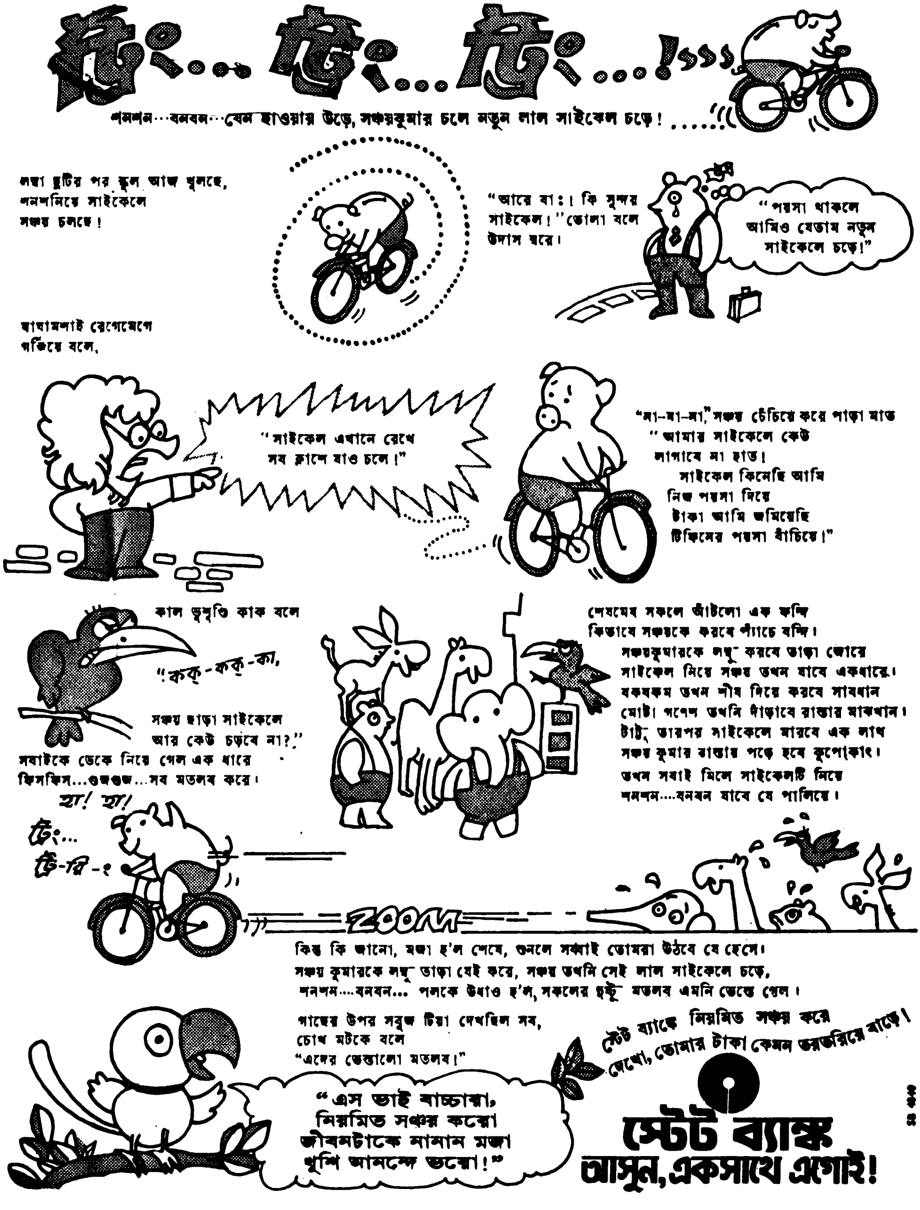
ট্রিং... ট্রিং... ট্রিং...!
শনশন...বনবন...যেন হাওয়ায় উড়ে, সঞ্চয়কুমার চলে নতুন লাল সাইকেল চড়ে!
লম্বা ছুটির পর স্কুল আজ খুলছে, শনশনিয়ে সাইকেলে সঞ্চয় চলছে!
"আরে বাঃ! কি সুন্দর সাইকেল!" ভোলা বলে উদাস স্বরে।
"পয়সা থাকলে আমিও যেতাম নতুন সাইকেলে চড়ে!"
মাষ্টারমশাই রেগেমেগে গর্জিয়ে বলে,
"সাইকেল এখানে রেখে সব ক্লাসে যাও চলে!"
"না–না–না," সঞ্চয় চেঁচিয়ে করে পাড়া মাত "আমার সাইকেলে কেউ লাগাবে না হাত। সাইকেল কিনেছি আমি নিজ পয়সা দিয়ে টাকা আমি জমিয়েছি টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে।"
কালো ভুশুণ্ডি কাক বলে
"কক্-কক্-কা, সঞ্চয় ছাড়া সাইকেলে আর কেউ চড়বে না?"
সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল এক ধারে ফিসফিস...গুজগুজ...সব মতলব করে।
শেষমেষ সকলে আঁটলো এক ফন্দি কিভাবে সঞ্চয়কে করবে প্যাঁচে বন্দি। সঞ্চয়কুমারকে লম্বু করবে তাড়া জোরে সাইকেল নিয়ে সঞ্চয় তখন যাবে একধারে। ধমধম তখন শীষ দিয়ে করবে সাবধান মোটা গণেশ তখনি দাঁড়াবে রাস্তার মাঝখান। টাট্টু তারপর সাইকেলে মারবে এক লাথ সঞ্চয় কুমার রাস্তায় পড়ে হবে কুপোকাৎ। তখন সবাই মিলে সাইকেলটি নিয়ে শনশন....বনবন যাবে যে পালিয়ে।
হা! হা!
ট্রিং... ট্রি-রি-ং
ZOOM
কিন্তু কি জানো, মজা হ'ল শেষে, শুনলে সব্বাই তোমরা উঠবে যে হেসে। সঞ্চয় কুমারকে লম্বু তাড়া যেই করে, সঞ্চয় তখনি সেই লাল সাইকেলে চড়ে, শনশন....বনবন... পলকে উধাও হ'ল, সকলের দুষ্টু মতলব এমনি ভেস্তে গেল।
গাছের উপর সবুজ টিয়া দেখছিল সব, চোখ মটকে বলে "এদের ভেস্তালো মতলব।"
"এস ভাই বাচ্চারা, নিয়মিত সঞ্চয় করো জীবনটাকে নানান মজা খুশি আনন্দে ভরো!"
স্টেট ব্যাঙ্কে নিয়মিত সঞ্চয় করে দেখো, তোমার টাকা কেমন তরতরিয়ে বাড়ে!
স্টেট ব্যাঙ্ক
আসুন, একসাথে এগোই!

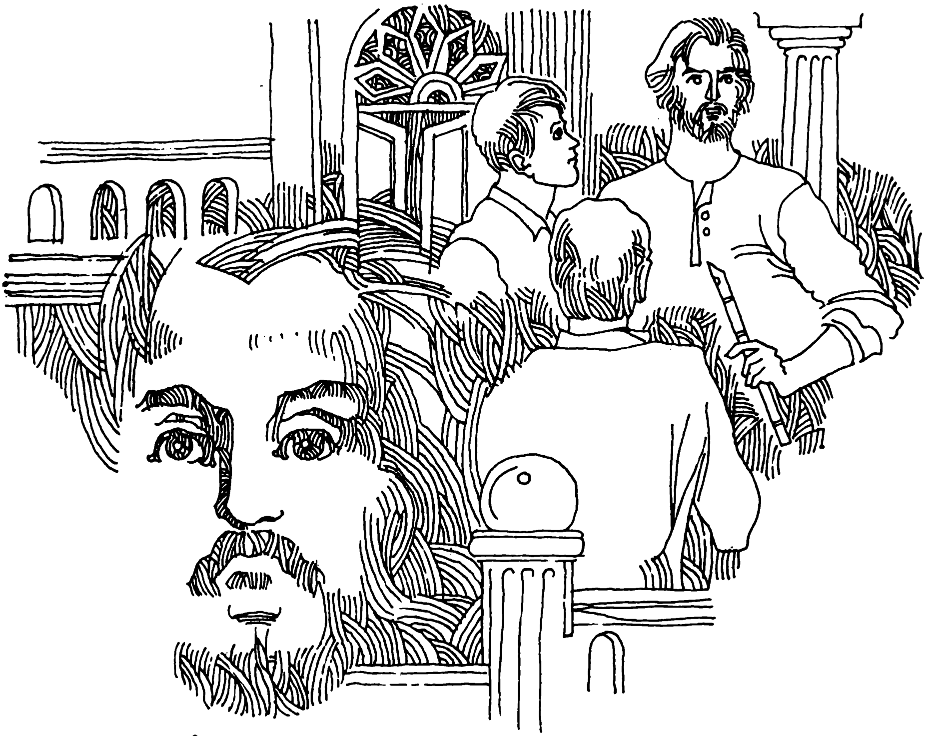

রাজার বাঁশি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, "রাজাবাবু এসেছে।"

অজয় সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে ছুটল। চিলেকোঠার ঘরে বসে রাজাবাবু একমনে বাঁশি বাজাচ্ছিল। অজয়কে দেখে বাঁশি থেমে গেল। আহ্লাদে অস্ফুটস্বরে অজয় ডাকল, "রাজাবাবু।"

রাজাবাবু বলল, "অজু, তুই? তুই এত বড় হয়ে গেছিস?"

চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে অজয় বলল, "কিন্তু রাজাবাবু, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে।"

ছাদে কাঠের প্যাকিং বাক্সে খাঁচায় পোষা সাদা ইঁদুরগুলো দাপাদাপি করছে। ছাদে জলের গামলা। ছড়িয়ে থাকা দানা আর পালক। পায়রার। অজয় পায়রা পোষে। ইঁদুরের শখ সুজয়ের। অজয় আর সুজয়কে ঠিক একইরকম দেখতে। ওরা যমজ ভাই। পার্থক্য কি একেবারেই নেই? আছে। দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি কিছুক্ষণ ধরে দেখলে আস্তে আস্তে পার্থক্যটা টের পাওয়া যায়। এতদিন বাদে অজয়কে একা দেখে রাজাবাবুর কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি। সুজয় কয়েকদিনের জন্যে মধ্যমগ্রামে ন'কাকার বাড়িতে বেড়াতে গেছে। বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে আস্তে আস্তে অন্ধকার জমে উঠছে। অজয় ঘরের আলো জ্বালাতে গেল। রাজাবাবু হাত তুলে বলে, "থাক না. অন্ধকারই তো ভাল।" চিলেকোঠার এই ঘরটায় রাজাবাবুকে সবচেয়ে ভাল মানায়। এই তক্তপোশ, কাঁচ-ভাঙা দেওয়াল-আলমারি, পুরনো টেবিল-চেয়ার নিয়ে রাজাবাবুর রাজ-দরবার। রাজাবাবুর মাথার চুল কতক পেকে গেছে, দাড়িগোঁফও কিছু কিছু পেকেছে। রাজাবাবু কি বুড়ো হয়ে গেল?

অজয় বলল, "তুমি বাঁশি বাজাও, আমি শুনব।"

রাজাবাবু সে কথায় আমল না দিলে বলে,

বিশিষ্ট কিশোর প্রকাশন

মঞ্জিল সেন

নীলপাখীর পালক

একটি ভালো ছেলের বড় হয়ে উঠবার জমাটি গল্প। সচিত্র। ৫·০০

ময়ূখ চৌধুরী

সংখ্যার নাম চার

বাঘের মত ভয়ংকর একটি মানুষের হাতে হাত মিলিয়েছিল দুঃসাহসী এক কিশোর, এক মল্লবীর ও তীরন্দাজ। কেন? বিস্মৃত অতীতের জীবন্ত কাহিনী। ১০·০০

সঙ্কর্ষণ রায়

বন্যরা বনে

শিকার, বন্যপ্রাণী ও বন—যেন এক স্বপ্নবিহার। সচিত্র। ১০·০০

নির্বেদ রায়

অরণ্যের অন্তরালে

শিকারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নানা দেশে। সচিত্র। ৬·০০

অনীশ দেব

নরকে আমিই রাজা

৬·০০

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

রুমঝুম্

স্বরলিপিসহ কিশোর নাটিকা। ক্লাব ও স্কুলের উপযোগী। ১০·০০

ডঃ মিহির মুখোপাধ্যায়

জমি ও ফসল

পশ্চিমবাংলার যে-কোন অঞ্চলের জমি থেকে সব চেয়ে ভালো ফসল পা'বার চাবিকাঠি দিচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ কৃষি-বিজ্ঞানী। ৬·০০

ফার্মা কে এল এম (প্রা) লিঃ
২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২, (দূরভাষ ২৭৪৩৯১)

"অজু, এদিকে আয়, আমার কাছে আয়, দেখি তোর হাতটা।"

ঘরে ঢুকে অজয় এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। একবার হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতে গিয়েছিল। রাজাবাবু তা দেয়নি। অজয় বলে, "হাত কেন। তুমি বাঁশি বাজাও।" নিজের লম্বা হাতটা বাড়িয়ে রাজাবাবু অজয়ের হাত ধরতে চায়। অজয় পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে।

অজয়ের হাত মুঠোয় নিয়ে রাজাবাবু বলে, "আয়, পাঞ্জা লড়ি।" কেবল চেহারাটাই পালটেছে, নইলে রাজাবাবু সেই একইরকম।

পরের দিন বাবা মধ্যমগ্রাম থেকে সুজয়কে নিয়ে এলেন। বাড়িতে ঢুকেই সুজয় আনন্দে চিৎকার করে ডেকেছে, "রাজাবাবু।" বিকেলবেলায় ওরা তিনজন ছাদে গেল। রাজাবাবু প্রসন্ন দৃষ্টিতে দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে। একেবারে একরকম। সেই ছোট্টটি তো আর নেই, বড় হয়েছে, তবু দুজনের চেহারা একরকম। ছোটবেলার মতন এখনও ওরা একরকম পোশাক পরে। দুজনের গায়ে একইরকম ডোরাকাটা জামা, পরনে নীল রঙের প্যান্ট, পায়ে সবুজ হাওয়াই চপ্পল। রাজাবাবু জানে তবু ওরা এক নয়। দুজনের মনের ধাঁচ, বুদ্ধি আর ইচ্ছেতে অনেক পার্থক্য আছে। ওদের হাত ধরে রাজাবাবু বলল, "চল, বেড়িয়ে আসি।"

দুলে দুলে গাড়ি চলছিল। অ্যাসফল্টের রাস্তায় টাট্টুঘোড়া দুটোর খুরের শব্দ আর মাঝে মাঝে চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ শুনতে শুনতে ওদের মনে হয় রাজাবাবু এক নতুন দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন শীতের কুয়াশা রাস্তার দুপাশের গাছে ও বাতাসে জড়িয়ে আছে। অদূরের রেল ইয়ার্ডে কতকগুলি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গঙ্গার অন্ধকারে নক্ষত্রের মতন আলো। কিন্তু এই ঘোড়ার গাড়ির কামরায় আলো নেই। খড়খড়ির পাখিগুলো তোলা থাকাতে রাস্তা থেকে সামান্য আলো আসছিল।

অজয় সুজয় নিজেদের দেশ দেখেনি। বাংলা দেশের সেই শ্যামল গ্রামের মাঠঘাট গাছপালা কিছুই দেখেনি। অনেকদিন আগে বাবার ঘরে দেখেছিল সেই গ্রামের একটি মানুষকে। তিন কুলে তার কেউ ছিল না, বাবা-মাকে প্রণাম করে সেই ঢ্যাঙা লোকটি বলেছিল "কাকাবাবু, আমি রাজেন্দ্র।"

বাবা লোকটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "রাজাবাবু, তুমি?" বাবা অজয় সুজয়কে বলেছিলেন, "রাজাবাবু আজ থেকে এ বাড়িতেই থাকবে। তোমরা রাজাবাবুর কাছে পড়বে।"

ছাদের চিলেকোঠার ঘরটা হল রাজাবাবুর। সন্ধেবেলায় দুই ভাই সে ঘরে পড়তে বসত। ছোট্ট ঘর। জানলা দিয়ে ছাদ, ভিড়-করা বাড়ি আর আকাশ দেখা যায়। এই ঘরটা বাড়ির সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে। পড়ানো শুরু করার আগে রাজাবাবু ওদের বলেছিল, "আমি যেমন তোদের আর তুমি-তুমি করব না, তেমনি তোরাও তোদের রাজাবাবুকে আপনি-আজ্ঞে বলে পর ও দূরের করিস না।"

শুধু কি সুদ কষা আর নল-চৌবাচ্চার অঙ্ক, শুধু কি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কিংবা সরলবর্গীয় বৃক্ষমালা ও তরাই অঞ্চলের বিবরণ, ভারতের খনিজ সম্পদও শুধু নয়, অথবা কারক-বিভক্তির জটিলতাই কেবল নয়, চিলেকোঠার ঘরে বসেই ওরা রাজাবাবুর সঙ্গে অন্য রাজ্যে চলে যেত। অলিভার টুইস্টের রাজ্যে। ট্রেজার আইল্যান্ডে। কখনও ওরা মিশে যেত ডেভিড কপারফিল্ডের আত্মায়। কত গল্পই না রাজাবাবুর জানা। রাজাবাবুর কাছে ওরা তন্ময় হয়ে শুনত স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের কাহিনী, ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের গল্প, বীর নেপোলিয়ানের কথা—এমনি আরও কত গল্প। অঙ্ক কষতে কষতে হঠাৎ কলম রেখে রাজাবাবু বলতে শুরু করত, "অসুস্থ ছেলেকে বাবা খেলনা হিসেবে একটা কম্পাস কিনে দিয়েছিলেন। ছ' বছরের সেই ছোট্ট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবত যন্ত্রের কাঁটাটা কেবল উত্তর দিকেই থাকে কেন। এই ছেলেটি কে জানিস?" এইভাবে অজয় সুজয় অভিভূত হয়ে শুনেছে আইনস্টাইনের গল্প। রাজাবাবু মেরু অভিযানের রোমাঞ্চকর ইতিহাসও বলেছিল ঠিক গল্পের মতো করে। সেই গল্প শুনতে শুনতে ওরা শিখে ফেলেছিল ভূগোলের কত তথ্য। সেই ছেলেবেলাটা অনেক দূরের নয়। রাজাবাবুর কাছে ওরা শিখেছিল মানুষের মনের ভেতরে আর একজোড়া চোখ থাকে। সেই চোখ দিয়ে মানুষ দূর-দূরান্তের সময়-সময়ান্তরের জিনিস দেখতে পায়।

দুই ভাইয়ের দু কাঁধে হাত রেখে ঠিক বন্ধুর মতন রাজাবাবু একদিন বলেছিল, "তোদের মনের ভেতর সত্যি একজোড়া চোখ আছে।" অজয়ের ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার দিকে। সুজয় গল্প লিখতে চেষ্টা করত।

এখন এই চলন্ত ঘোড়ার গাড়িতে হঠাৎ রাজাবাবু জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ রে, তোদের আঁকা-লেখা চলছে তো?"

কে জবাব দেবে? অবশেষে সুজয়ই জবাব দেয়, "সে সব খেয়াল কবে মিটে গেছে।" রাজাবাবু চুপ করে রইল।

একদিন রাজাবাবু উধাও হয়ে গিয়েছিল। তখন ওরা দুজনে ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওদের সে যে কী কষ্ট হয়েছিল বলার নয়। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল। বাবা কিন্তু বিচলিত হননি। মা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাবাকে বলেছিলেন, "তুমি কি মানুষ নও? জলজ্যান্ত একটা ছেলে রাতারাতি হারিয়ে যাবে? তুমি একটুও খোঁজটোঁজ করবে না? আহা, তার তিন কুলে কেউ নেই। আমরাই তো সব।"

বাবা শান্ত গলায় বলেছিলেন, "চিন্তার কিছু নেই। ও এইরকমই। বরাবর এমন খেয়ালি। বোহেমিয়ান। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই ওকে চিনি।" কিন্তু মা কিছুতেই শোনেননি। তাই হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। পুলিসে খবর দেওয়ার কথা যখন ভাবা হচ্ছে ঠিক তখন রাজাবাবুর চিঠি এসেছিল। বাবাকে লেখা সেই ছোট্ট চিঠিতে রাজাবাবু জানিয়েছিল আর ফিরবে না। কোথায় যাচ্ছে, কী করবে, তার কোনো ঠিক নেই। কোথা থেকে রাজাবাবু সে চিঠি লিখেছিল তা জানায়নি। অজয় সুজয় পোস্টকার্ডের ওপর মোহরের ছাপটায় তন্নতন্ন করে পোস্ট অফিসের নামটা খুঁজেছিল। কিন্তু সেই অস্পষ্ট ছাপ থেকে কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। চিলেকোঠার ঘরটায় সবই ছিল। ছিল না শুধু রাজাবাবু। ওরা যখন-তখন ঐ ঘরে চলে যেত। কখনোই একসঙ্গে দুজনে নয়। ওরা একা-একা সেই ঘরটায় ঘুরত, নিজেদের মনে ফিসফিস করে কতদিন বলেছে—'রাজাবাবু, তুমি যেখানেই থাকো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

কিন্তু তারপর? তারপর আর কী বলতে পারা যায়। মা মৃত্যুশয্যায়? কিংবা বাবার

অবস্থা খুব খারাপ? খবরের কাগজে এই-রকমই তো লেখা থাকে। তা তো বলা যায় না। তাই দুজনেই মনে মনে বলেছিল : আমাদের বড্ড মন কেমন করছে। তুমি ফিরে এসো। রাজাবাবু।

দিনের পর দিন সবাই রাজাবাবুর জন্যে অপেক্ষায় থেকেছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় অনেকদিন দুই ভাই ভাবতে ভাবতে ফিরেছে যদি বাড়ি গিয়ে দেখি রাজাবাবু ফিরে এসেছে। কিন্তু সেসব কিছুই ঘটেনি। চিলেকোঠার ঘরে ওরা আর পড়তে বসত না। ট্রাম-রাস্তার ওপারে সুধাংশুবাবুর কোচিং ক্লাসে ওরা ভর্তি হয়েছিল। অজয় আর ছবি আঁকত না। সুজয়ও লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়েছিল। আজ এই প্রথম ওরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ল। বহুকাল আগে রাজাবাবুই তো বলেছিল "তোদের একদিন ঘোড়ার গাড়িতে চড়াব।" কিন্তু মনুমেণ্টে তো আজো ওঠা হয়নি। আজও তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতর ঢোকা হয়নি। অল্প অল্প ঠাণ্ডা ছিল। অজয় সুজয়ের গায়ে গরম জামা ছিল না। রাজাবাবুর গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি। রাজাবাবু বরাবর পায়জামাই পরে।

রাজাবাবু জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ রে, তোদের ঠাণ্ডা লাগবে না তো?" ওরা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, না, ঠাণ্ডা লাগবে না। ওদের ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা চলে যায়। কেল্লার কাছে ঢালু জমিতে গিয়ে ওরা বসে। অজয় সুজয়ের এই মুহূর্তটিকে ভীষণ ভাল লাগে। এই আকাশ, কেল্লার ঢালু জমি, আসন্ন শীতের মধ্যে এখানে-ওখানে কয়েকটা ন্যাড়া গাছে পাখিদের চিৎকার। গঙ্গায় স্টীমারের বাঁশি বাজছিল। এমন-কী ওরা অদূরের গঙ্গায় নোঙর করা জাহাজের মাস্তুলও দেখতে পেল। অজয়ের মনে হয় ঠিক যেন আঁকা ছবি। কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে জাহাজের মাস্তুল আকাশের দিকে মুখ করে আছে। সুজয় ভাবল এই পরিবেশ, এই ভাল-লাগাটা সে কি লিখে রাখতে পারে না? এইরকম যখন ওরা ভাবছিল ঠিক তখনি রাজাবাবুর বাঁশি বেজে উঠেছিল। রাজাবাবু একমনে বাঁশি বাজাচ্ছে। ওরা অভিভূত হয়ে সে বাঁশি শোনে। তারপর বাঁশি বাজানো শেষ হলে রাজাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

একসময় রাজাবাবুই কথা শুরু করে. "অনেকদিন পরে চিলেকোঠার পুরনো ঘরে এসে আমার ভাল লাগল। কাকাবাবু, কাকিমা আর তোদের দেখে মনে হল, সময় অনেক দূরে গড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে কত দেশ, কত গ্রাম-গঞ্জ শহরে ঘুরেছি। এই ভারতবর্ষটা বিরাট। বৈচিত্র্য এখানে অনেক। নদী দেখেছি, পাহাড় দেখেছি, আর কত রকমের মানুষ দেখেছি। বিচিত্র সব মানুষ। বারবার তোদের কথা মনে পড়েছে। যদি তোরা থাকতিস তবে তোরা আঁকতিস, লিখতিস। কিন্তু এ রাজাবাবুর তো সে হাত নেই। এ হাত ছবি আঁকতে পারে না, লেখার ক্ষমতাও এ হাতের নেই। এই হাত বড়জোর একটা বাঁশিকে তুলে নিতে পারে মুখের কাছে। আমি বাঁশি বাজিয়েছি। কোথাও থেমে থাকিনি। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা বারবার মনের ভেতরে বেজে উঠেছে। বল্ তো কোন্ কবিতাটা?"

অজয় ভাবতে বসে। সুজয় বলে, "সেই কবিতাটা কি রাজাবাবু? ঐ যে 'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে তাকাসনে ফিরে'?"

রাজাবাবু খুশি হয়ে সুজয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "বাহ্, ভেরি গুড।" তারপর রাজাবাবু একটু চুপ করে থাকে। হয়তো কিছু ভাবে। পরক্ষণে আবার বলতে শুরু করে, "এই দ্যাখ না, তোদের দুজনের চেহারা প্রায় একই রকমের। কিন্তু একজন আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারলি, একজন পারলি না। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ এক এক রকমের। একজন থেকে আর একজন আলাদা। ঠিক সেই রকম রাত্রি কিংবা সকাল এক একদিন এক একরকমের। দেশে দেশে মাটির রঙের মধ্যে কত পার্থক্য। সব দেশে সব মাটিতে সব রকমের ফুল বা ফল বা গাছ জন্মায় না। এসব তোদের ভালভাবে বুঝতে হবে। আর তোদের নিজেদের সাধনায় ফিরে যেতে হবে।"

দুজনে একই সঙ্গে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল. "সাধনা?"

তখন রাজাবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশ দেখতে দেখতে বলল. "লেখা আর আঁকা।"

একদিন সকালবেলায় উঠে বাড়ির সবাই দেখল রাজাবাবু আবার উধাও। বাবা শুধু বললেন, "আর একটা শ্রীকান্ত।" চিলেকোঠার ঘরটার দিকে তাকালে রাজাবাবুর কথা মনে পড়বেই। বিকেলবেলায় ওরা ছাদে দাঁড়িয়ে

ছিল। কাঠের প্যাকিং বাক্সের খাঁচায় সাদা ইঁদুরগুলোর মাতামাতি। মেতেছে পায়রারাও। ছড়িয়ে থাকা দানা খুঁটে খাচ্ছে, খাচ্ছে জল, পাখা নাড়ছে।

রাজাবাবু প্রায়ই বলত, এবারও বলেছে, "ডালভাত খেয়ে মামুলিভাবে জীবনটা খরচ করার কোনো মানে নেই।"

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে গেল। চিলে-কোঠার ঘরে আলো জ্বলছে। রাজাবাবু নেই, তবু সন্ধেবেলায় এ ঘরে আলো জ্বলছে কেন? অজয় চেয়ারে বসে আছে। সামনে টেবিল। সুজয় তক্তপোশে। আজ থেকে ওরা এ ঘরেই পড়বে। স্কুল নয়, এখন ওরা কলেজে পড়ে। কিন্তু এখন তো ওরা পড়ছে না। অজয় আঁকতে বসেছে। সুজয় লিখবে। অনেকদিন সাইকেল না চালালে কিংবা সাঁতার না কাটলে প্রথম প্রথম সাইকেলে চড়তে কিংবা জলে নামতে ভয় হয়। কিন্তু একবার সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটা শিখে নিলে তা কোনোদিন মানুষ ভুলে যায় না। কী লিখি, কী আঁকি ভাবতে ভাবতে ওরা দুজনেই চোখ তুলে একসঙ্গে দেখতে পেল তাকের ওপর পড়ে আছে রাজাবাবুর বাঁশিটি। ওদের মনে হল রাজাবাবু ওটা ইচ্ছে করেই রেখে গেছে। ওদের হারানো সুর ঐ বাঁশিতেই জাগবে। রাজাবাবু যাকে বলত সাধনা।

ছবি অনূপ রায়

মণিমেলার খবর

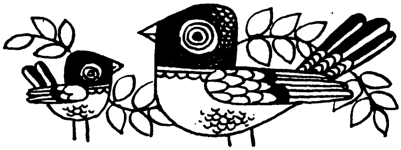

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের ১৯৭৯-৮২ সালের কেন্দ্রীয় পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে : কেন্দ্রপ্রধান—শ্রী টি এন সিং (রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ), কেন্দ্রপতি—শ্রী অশোককুমার সরকার, কেন্দ্রমূল—শ্রী বিমল ঘোষ (মৌমাছি), কোষাধ্যক্ষ—শ্রী জয়চাঁদ পালিত, কেন্দ্রমণি—শ্রী ভবতোষ বসু, বিভাগীয় সচিববৃন্দ : সংগঠন—শ্রী বিষ্ণুরাম সেন, শিক্ষা—শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, ক্রীড়া—শ্রী অরুণ মৈত্র, সংস্কৃতি—শ্রী অজয় চক্রবর্তী, অর্থ—শ্রী চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়, শিল্প শ্রী শংকরলাল মল্লিক, প্রচার—শ্রী হিরন্ময় সমাদ্দার, কার্যালয়—শ্রী নিখিল নন্দী, সদস্যবৃন্দ—মনোজ চক্রবর্তী, অমিয় সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ দত্ত এবং প্রভাসরঞ্জন দে।

আঞ্চলিক সংবাদ

হাবড়া আঞ্চলিক কর্মী শিক্ষণ-শিবির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এ অঞ্চলের মণিমেলা-গুলির শিশুকল্যাণ কর্মীরা খেলাধুলা, শিল্পকর্ম ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে।

মণিসন্দেশ

মণিমেলার এই শাখাকেন্দ্রগুলি সম্প্রতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ক্রীড়া-সঙ্গীত-নৃত্য প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদির আয়োজন করেছিল : অশোক-নগর নবারুণ মণিমেলা, বেহালা দক্ষিণপল্লী মণিমেলা, নবদ্বীপ পঞ্চবটী মণিমেলা, আসান-সোল সোনার তরী মণিমেলা, গাইঘাটা সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলা, আসানসোল সঙ্ঘশ্রী মণিমেলা এবং সোনারপুর কিংশুক মণি-মেলা।

বিশেষ খবর

যাদবপুরের অনির্বাণ মণিমেলা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের উদ্বোধন করেছে সম্প্রতি। গ্রন্থাগারে দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি পাঠ্যপুস্তক-বিভাগও থাকবে।

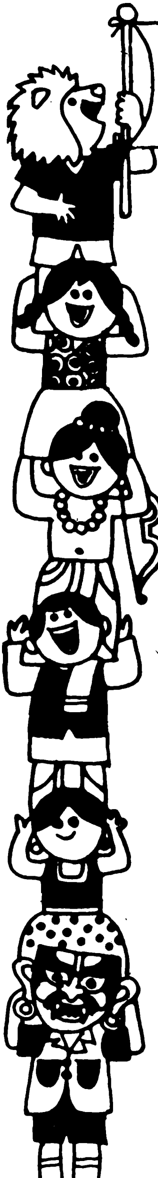

ছোটদের রাজ্যে এইচ এম ভি

ছোটরা রূপকথার কাহিনী শুনতে ভালবাসে। ভালবাসে রামায়ণের গল্প। আর অবাক হয়ে শোনে দৈত্য দানো, পশুপাখির মজার গল্প। শিশুমনের এই কল্পরাজ্যের খোরাক জোগায় এইচ-এম-ভি'র রেকর্ড-সম্ভার। গানে গানে সুরে সুরে সেই সব কাহিনী মজাদার করে তুলতে এইচ-এম-ভি'র শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের জুড়ি মেলা ভার।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আপনার শিশুর হাতে তুলে দিন সেরা উপহার!

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ

রবীন্দ্রনাথের ২৩টি ছড়া, গান ও কবিতার একটি অনবদ্য সংকলন। শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার উদ্দেশ্যেই এই স্টিরিও এল.পি. রেকর্ড প্রকাশন। ছোট্ট শিল্পীদের গাওয়া প্রতিটি গান এবং আবৃত্তি পাঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

অংশগ্রহণে : সুদেষ্ণা, ইন্দিরা, মধুমিতা, রাজদীপ, রাহুল, অংশু, প্রিয়ম, প্রমিত, প্রীতম, সংদীপ, অনিরুদ্ধ, দিব্যেন্দু, রমা, নীলাঞ্জনা, আঞ্জনা, স্বস্তিকা, শ্রীনন্দা ও শুভশ্রী।

সংকলন ও পরিচালনা : সুচিত্রা মিত্র
যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনা : ভাস্কর মিত্র

আলিবাবা

ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত গীতিনাট্য। দুটি স্টিরিও এল.পি. রেকর্ডে সম্পূর্ণ।

ঠাকুরমার ঝুলি

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে একটি পপুলার এল.পি. রেকর্ডে পরিবেশিত গীতিনাট্য।

ছোটদের রামায়ণ

বাল্মীকির মহাকাব্য অনুসরণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত গীতিনাট্য —একটি পপুলার স্টিরিও এল.পি. রেকর্ডে সংকলিত।

হিংসুটে দৈত্য

আর একটি পপুলার স্টিরিও এল.পি. রেকর্ডে বিখ্যাত গল্পের গীতিনাট্য। রচনা : ভাস্কর বসু

কেশবতী রাজকন্যা

একটি ৪৫ এল.পি. রেকর্ডে ইন্দিরা দেবী রচিত রূপকথার গীতিনাট্য।

আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুগীতির এই জনপ্রিয় শিল্পীর ছড়াগান আজও নতুন মনে হয়। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গান পরিবেশিত হয়েছে একটি সুপার সেভেন ও একটি ঈ.পি. রেকর্ডে।

ছোটদের নজরুল

কাজী সব্যসাচীর কন্ঠে কাজী নজরুল রচিত ছোটদের কবিতার আবৃত্তি। ঈ.পি. রেকর্ডে।

হ্যাপি বার্থডে টু ইউ

মায়া সামীর কণ্ঠে গানগুলি হয়ে উঠেছে অতি মনোরম ও উপভোগ্য। আপনার বাচ্চারা সারাবছর শুনে আনন্দ পাবে।

আপনার নিকটবর্তী এইচ এম ভি ডিলারের কাছে এসে রেকর্ড বেছে নিন।

HMV

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

GC 3187 R

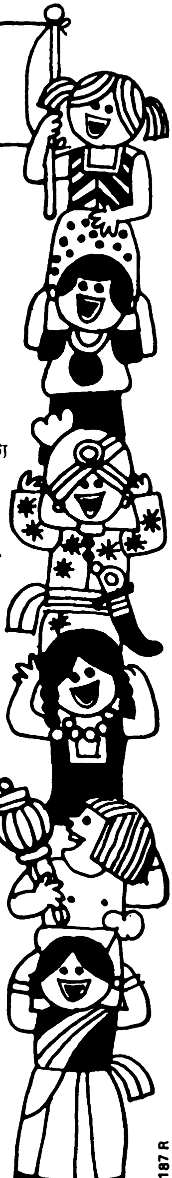

ছবি এঁকেছে অরিন্দম বসু (বয়স ১২)

ছুটির দিনে

১৫ই আগস্ট ছুটির দিন। ওইদিন বাবা ও মা-মাসিদের সঙ্গে আমি বিধান শিশু উদ্যানে গিয়েছিলাম। ওখানে গানবাজনা শুনে, ভেলপুরি খেয়ে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে দেখি, আনন্দমেলা এসে গেছে। কী মজা! আনন্দমেলা পড়তে পড়তে কখন যে ছুটির দিনটা ফুরিয়ে গেল, টেরই পেলাম না।

তমালী বসু (বয়স ৬)

বাড়ির পথে

আকাশের মুখখানা ঘোর কালোকিষ্টি,
সারাদিন ঝরাচ্ছে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি।
পথঘাট ভেসে গেছে, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ।
ভিজে মাটি, চারিদিকে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।
একহাঁটু জল ভেঙে ইস্কুল ছাত্রী,
চলেছে বাড়ির পথে অসহায় যাত্রী।

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৩)

ছবি এঁকেছে **সুমিত্রা সরকার** (বয়স ১২)

বন্দুকের ভয়ে

আমি একদিন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। নটা পঞ্চান্ন তখন। একটু পরেই নটা সাতান্ন হয়ে গেল। আমার পড়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি আর পড়লাম না। আমার সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল। আমি সেটা নিয়ে অন্ধকার দালানে গিয়ে যেই না দাঁড়িয়েছি, অমনি আমার ছোটবোন চিৎকার করে উঠল ভয় পেয়ে। ছোট বোন ছিল মায়ের কোলে। বন্দুকের নলের মুখে একটা রবার ছিল। সেই রবারটা আমি বোনের হাতে দিলাম। তখন ওর ভয় কেটে গেল।

কল্পন ঘোষ (বয়স ৬)

তালগাছ

আমাদের বাড়ির সামনে চারটে তালগাছ। দুটো বড়, আর দুটো একটু ছোট। বড় দুটোকে আমরা বাবা আর মা তালগাছ বলি। ছোট তালগাছ দুটোকে বলি তাদের ছেলেমেয়ে। আমার খুব তালগাছ ভাল লাগে। তালগাছে একটা পাখির বাসা। আমি পাখিটাকে চিনি না। মা বলল, "বাবুই পাখি"।

তালগাছগুলোর সঙ্গে আমার খুব ভাব। রোজ বিকেলে আমি তালগাছগুলোর নীচে যাই। আমাকে দেখলেই বাবুই পাখি উড়ে যায়। বাবুই পাখিরা ভাল না, খুব দুষ্টু। তালগাছগুলো বেশ ভাল, খুব লক্ষ্মী।

হিরণ্ময় দাশ (বয়স ৯)

কঙ্গো

দিদিমণি

নীল নদের পর কঙ্গো আফ্রিকার দীর্ঘতম নদী। কঙ্গো নদীর দৈর্ঘ্য ২,৯০০ মাইল বা ৪,৭০০ কিলোমিটার। এই নদী বেরিয়েছে জাম্বিয়া থেকে, জায়গাটা টাঙ্গানাইকা এবং মায়াসা হ্রদের মাঝামাঝি। ওখানে এর নাম চামবেশি নদী। এই নদী প্রথমে উত্তর-পশ্চিমে, তারপর পশ্চিমে এবং তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ছে। নদীর অববাহিকার আয়তন ১,৩৩৫,০০০ বর্গমাইল বা ৩,৪৫৭,০০০ বর্গ-কিলোমিটার এবং এই নদীটি বায়ের, কঙ্গো বা ব্রাজাভিলে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, পশ্চিম জাম্বিয়া, উত্তর আঙ্গোলার অধিকাংশ অঞ্চল এবং ক্যামেরুন ও টাঙ্গানিয়ার কিছু কিছু অঞ্চল জুড়ে বয়ে যাচ্ছে।

কঙ্গো নদীর গতিপথের অনেকটা অংশই আফ্রিকার জলপথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের কাছে অবশ্য লিভিংস্টোন জলপ্রপাতের জন্যে নদীপথ জলপথ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। ২০০ মাইলের মধ্যে প্রায় ৩২টি ছোট ছোট ঝর্না আছে।

আমাজন নদীর মতো কঙ্গো নদীও নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এখানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টির জলে কঙ্গো নদীর জলধারা পুষ্ট হয়। উৎস অঞ্চলে লুয়ালাবা নদী প্রচুর জল বহন করে আনছে কঙ্গো নদীতে। কঙ্গো নদীর অববাহিকা বিশাল—প্রায় সম্পূর্ণ অংশেই অনেক উপনদী এসে মিশেছে এই নদীতে। উত্তরে সাহারা মরুভূমি এবং দক্ষিণে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তীরে কঙ্গো নদীর উপত্যকা একটি সুবিশাল নিম্নভূমি। আফ্রিকার হ্রদ অঞ্চল আছে এর পূর্ব দিকে।

উচ্চভাগ : উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশে কঙ্গো নদীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কঙ্গো নদী উৎস অঞ্চলে অনেক উপনদীর সঙ্গে মিশেছে এখানে আছে অনেক হ্রদ ও জলপ্রপাত। অনেকগুলি প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের নদী মিলিত হয়ে কঙ্গো নদী সৃষ্টি করেছে। এই নদীগুলি আবার কোথাও কোথাও হ্রদের মতো চওড়া হয়ে গেছে। উপনদীগুলির উচ্চভাগে অনেক জলপ্রপাত আছে। উপনদীগুলি অনেক হ্রদের জল বহন করে আনছে কঙ্গো নদীতে।

মধ্যভাগ : এর নিম্ন অংশে কিসানগানিতে পর পর সাতটি জলপ্রপাত আছে, সেগুলিকে বলা হয় স্ট্যানলি জলপ্রপাত। এর পর থেকে কঙ্গো নদী নৌকা চলাচলের যোগ্য। এর পরে ১,০০০ মাইল কঙ্গো নদী সমানভাবে বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এই নদী সরু কিন্তু তার পরে একটি চওড়া নদীতে পরিণত হচ্ছে।

নিম্নভাগ : মধ্যভাগ ছাড়িয়ে এসে কঙ্গো নদী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাঝখানের পনেরো থেকে সতেরো মাইল চওড়া জলাভূমিকে বলা হয় ম্যালেবো পুল। এর পরেই নদীতে অনেক জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে শেষের জলপ্রপাতটির থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র ৯০ মাইল। তারপর নদী সরু গভীর খাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

জলবায়ু : অধিকাংশ জায়গাতেই বৃষ্টিপাত বেশি হয়। কিন্তু নিরক্ষরেখা থেকে যত দূরে যাওয়া যায় বৃষ্টিপাত তত কমতে থাকে।

উদ্ভিজ্জ : অধিকাংশ জায়গাতেই ঘন চিরহরিৎ গাছপালা দেখা যায়। প্রায় চার ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বনভূমি গভীর।

জীবজন্তু : কঙ্গো নদীর জলে নানা রকমের মাছ পাওয়া যায়। শুধু ম্যালেবো পুল অংশেই ২৩৫ রকমের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। কুমির, নানা রকমের কচ্ছপ ও জলাভূমির সাপও আছে। জঙ্গলে নানা ধরনের পাখি আছে, তাদের সংখ্যা ২৬৬ জাতের কম নয়।

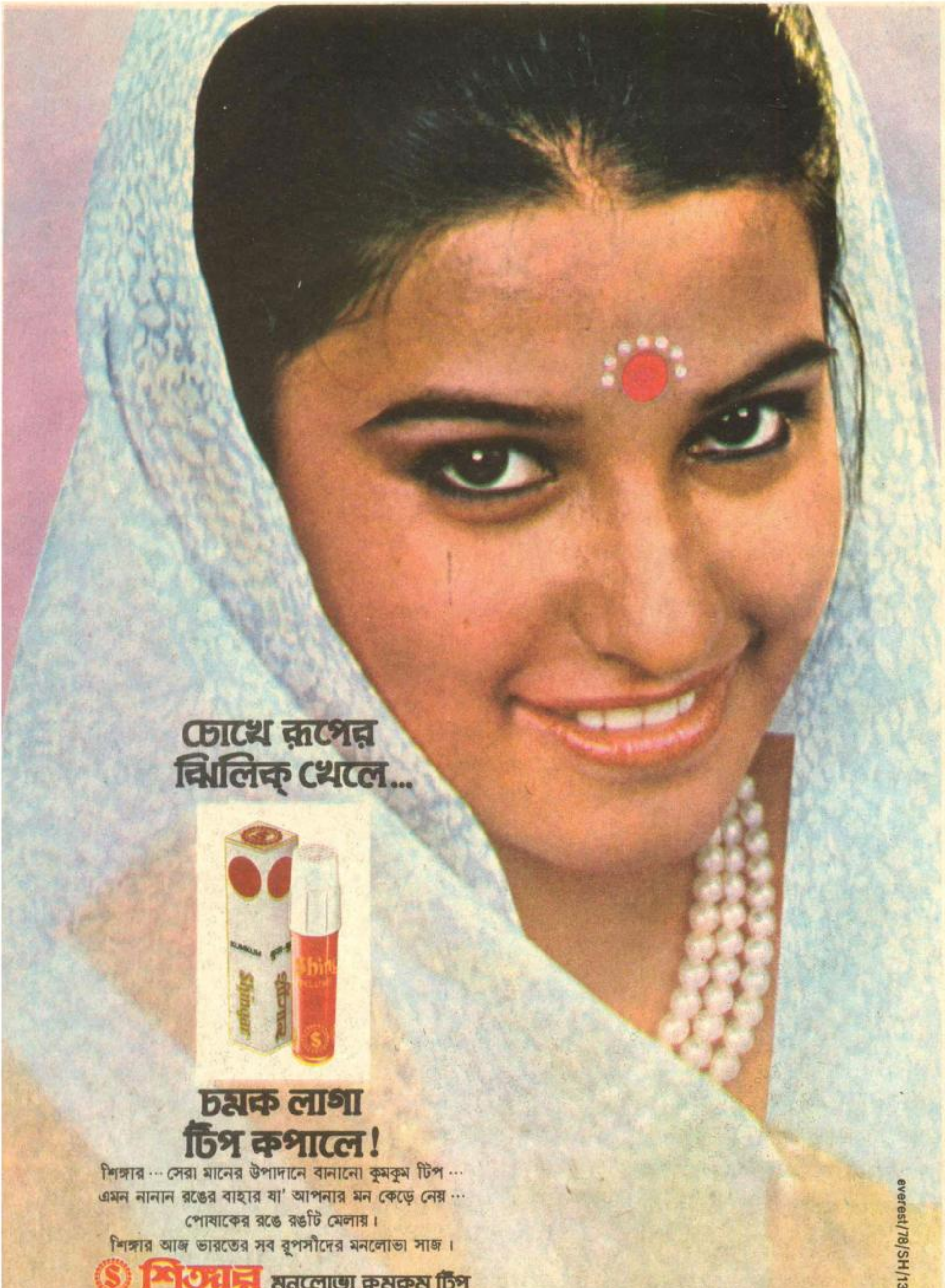
চোখে রূপের
ঝিলিক্ খেলে...
চমক লাগা
টিপ কপালে!
শিঙ্গার ··· সেরা মানের উপাদানে বানানো কুমকুম টিপ ···
এমন নানান রঙের বাহার যা' আপনার মন কেড়ে নেয় ···
পোষাকের রঙে রঙটি মেলায়।
শিঙ্গার আজ ভারতের সব রূপসীদের মনলোভা সাজ।
শিঙ্গার মনলোভা কুমকুম টিপ
ভারতীয় সৌন্দর্যের সুন্দরতম সাজ
everest/78/SH/135-bn

শখের গোয়েন্দা

আনন্দ বাগচী

কদিন আগেও অনেক হিসেব মিলত না তাঁর নিজের,
যখন-তখন দড়ি ছিঁড়ে ট্রাবল দিত ইজের।
ট্রানস্লেশনের মলাট ঘেরা লোম-খাড়ানো কেতাব,
ধরা পড়লে গাধার টুপি, মুখরোচক খেতাব!
হাতের মধ্যে স্লেট-পেন্সিল, আইসক্রীমের কাঠি
খাতার পাতায় গোল্লা খেতেন, মাথায় কষে চাঁটি।
এই সেদিনও লাট্টু-লাটাই ডাংগুলি আর লুডো,
এখন শেখেন ঘুষোঘুষি, এখন শেখেন জুডো।

চক্ষুকর্ণ সজাগ আছে ফাঁক করে খড়খড়ি,
পাশের ছাদে ভুতোর পিসি শুকোয় কেন বড়ি!
বঁড়শি-বেঁধা মাছের মতো পড়শিরা তটস্থ,
ছায়ার মতো ফলো করেন, দৈর্ঘ্য মাপেন, প্রস্থ।
ডিটেকটিভের পকেটখানা মাল বহনের সহায়
তত্ত্ব-তালাশ অনেক কিছুর গোপন খবর কহায়।
মাপের ফিতে, আতশ কাঁচি হরেকরকম চিজের
কৌটো থাকে, ধার থাকে না প্যাণ্টালুনের ক্রীজের।
গোয়েন্দা-রাজ বল্টুবাবু খুঁজে বেড়ান সূত্র
টায়ার কিংবা হাতের পায়ের ছাপ রয়েছে কুত্র!

ছবি: দেবাশিস দেব

চারপেয়ে উপমা

কুন্তক

তুমি তো বললে উপমা? আর অমনি আমার মনে পড়ল যে, একরকম মাদ্রাজি খাবার আছে, তাকে বলে উপ্‌মা।

তুই তো পেটুকপ্রবর, তোর তো ওরকম মনে পড়বেই।

টুম্পি বলল ঃ উপ্‌মা একরকম খাবার? বাঃ, বেশ মজার তো শুনতে!

শুনতে মজার, খেতেও মজার। আবার, নন্তুর যে এটা মনে পড়ল হঠাৎ, এও মজার। কেন মনে পড়ল বল তো?

কেন, শুনতে একরকম বলে!

আমাদের উপমার ব্যাপারটাও কিন্তু তাই। একটা কথা আরেকটা কথাকে টেনে নিয়ে আসে, শুনতে একরকম বা দেখতে একরকম বলে। কিংবা হয়তো গন্ধে ছোঁয়ায় বা স্বাদে একরকম।

তার মানে, দুটো শব্দ শুনতে একরকম হলেই উপমা হবে?

না না, তা নয়। শব্দটা শুনতে একরকম হলে হবে না। শব্দ দিয়ে যে জিনিসটা বোঝাচ্ছে, তার কথা বলছি। ধর, সেই জিনিসটার আওয়াজ

সে আবার কী? জিনিসের আওয়াজ মানে?

অনেক শব্দেরই একটা মজা কী জানিস, শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে একটা আওয়াজ শুনতে পাবি, নয়তো একটা ছবি দেখবি, হয়তো গন্ধ পাবি কিছুর, হয়তো ছোঁয়া, হয়তো স্বাদ।

বাজে কথা।

বাজে? আচ্ছা, বললাম, তারা। দেখতে পেলি কিছু?

নন্তু বলল ঃ না। দিনের বেলায় তারা? পাগল নাকি?

টুম্পি একটু ভেবে বলল ঃ হ্যাঁ রে দাদা আমি যে মনে মনে দেখলাম, আকাশভর্তি তারার ছবি।

যদি বলি ঝিঁঝি পোকার ডাক? শুনতে পাস কিছু? মনে মনে?

হ্যাঁ, পাচ্ছি।

এখন, এই ঝিঁঝির আওয়াজ শুনে যদি তার আর কোনো আওয়াজের কথা মনে পড়ে, তারা দেখে যদি আর কিছু মনে পড়ে তোর, সেই কথাটা খুলে বললেই হয়ে গেল উপমা।

বলো দেখি তেমন একটা উপমা।

বলব? পড়েছিস রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'? মনে পড়ে তার **'পরিশোধ'** কবিতাটা, যার মধ্যে আছে শ্যামা?

পড়েছি। মনে নেই সব লাইন!

সেখানে রাত্রির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রের মতো।

সনে মানে কি সঙ্গে?

সনে নয়, স্বনে। শব্দে, আওয়াজে। কী হল ব্যাপারটা? অন্ধকারে ঝিল্লির আওয়াজে কবির এখানে মনে পড়ে গেল বীণাধ্বনির কথা।

কান্ড!

কিন্তু সুন্দর না? ভেবে দেখ একটু। গাছপালায় ঘেরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির ডাকটা কত যেন সামনে এসে পড়ল মনে হয়। সেই ডাকটার কথাই তো বলতে চান কবি? তুলনা যে দিচ্ছেন, উপমা যে দিচ্ছেন, সে তো ওরই জন্যে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

সেইজন্য এই ঝিল্লিস্বনকে বলব উপমেয়। আর, কী দিয়ে বোঝাচ্ছেন এই ধ্বনিটাকে?

বীণার আওয়াজে।

বীণাতন্ত্রকে তাই বলব উপমান। দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? দুটোই যেন 'কাঁপিছে সঘনে'। এই তাহলে এদের মিলের লক্ষণ, একে বলব এদের সাধারণ ধর্ম। আর মিলিয়ে দেবার মতো শব্দও রইল একটা, 'মতো'। ব্যস, হয়ে গেল পুরোটাই। উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, আর মতো। একেই বলে চারদিক থেকে খুলে দেখানো।

নন্তু বলল ঃ বাঁচা গেল! উপমা তাহলে মানুষ নয়, একেবারেই এক চারপেয়ে জীব। দেব একদিন এক ঠ্যাং খোঁড়া করে! (ক্রমশ)

ভাই-বোন

প্রসাদ

চম্বলবাবু এখন ইস্কুলে। বাড়িতে আরাবল্লী যে সকাল থেকে নিখোঁজ, তার বোন যে ভেবে ভেবে অস্থির, সে কি তার খবর রাখে? তা ছাড়া একটা বেড়ালকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি তার অসহ্য মনে হয়।

হত অ্যালসেশিয়ান, বোঝা যেত।

Chameli loves cats.

Chambal doesn't love cats.

Chambal wants an alsatian in the house.

Chameli doesn't.

Chameli is at home, thinking of Araballi.

Chambal is at school, learning geography.

Chambal is sitting in his class-room.

Chameli is praying for the return of Araballi.

Chameli is feeling very miserable.

Chambal is listening to the teacher.

চামেলি আর চম্বলে এইরকম কথাবার্তা হতে পারত:

Chambal: Why do you love cats?

Chameli: Because they're such soft, cuddly things. But why do you like alsatians?

Chambal: Because they're big and strong and intelligent. And they don't steal fish from the kitchen. Why does Araballi steal?

Chameli: Because she gets hungry.

Chambal: Why doesn't she catch mice and eats them?

Chameli: There are no mice in the house. And why do dogs

always chase cats? Nasty brutes!

Chambal: Alsatians don't. They don't take any notice of cats. Don't they have better things to do?

Chameli: Look at the alsatian next door. What does he do except eat and sleep?

Chambal: Burglars know what alsatians do. You try to steal into the house late at night and you'll find out. And what about cats? All they do is fight with other cats in the street.

Chameli: Araballi never fights.

তা হলে আমরা কী কী ধরনের বাক্য এ পর্যন্ত দেখেছি? নীচে চার রকমের বাক্যের দুটো করে নমুনা দিলাম

(a) Chameli was sad.
Agnimitra left the house.

(b) Chameli is searching for Araballi.
Araballi is missing.

(c) Chambal has gone to school.
Chameli has returned from school.

(d) Mr. Roy drives his own car
Mrs. Roy is a good cook.

শেষকালে আরেকবার মনে করো নীচের জোড়া-জোড়া বাক্যগুলোর মধ্যে কী তফাত:

(a) Mr. Roy drives his own car.
Mr. Roy is driving to his chamber.

(b) Chameli went to school this morning.
Chambal has gone to school.

এবারে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো:

(a) Where is Chameli now?

(b) Where is Chambal now?

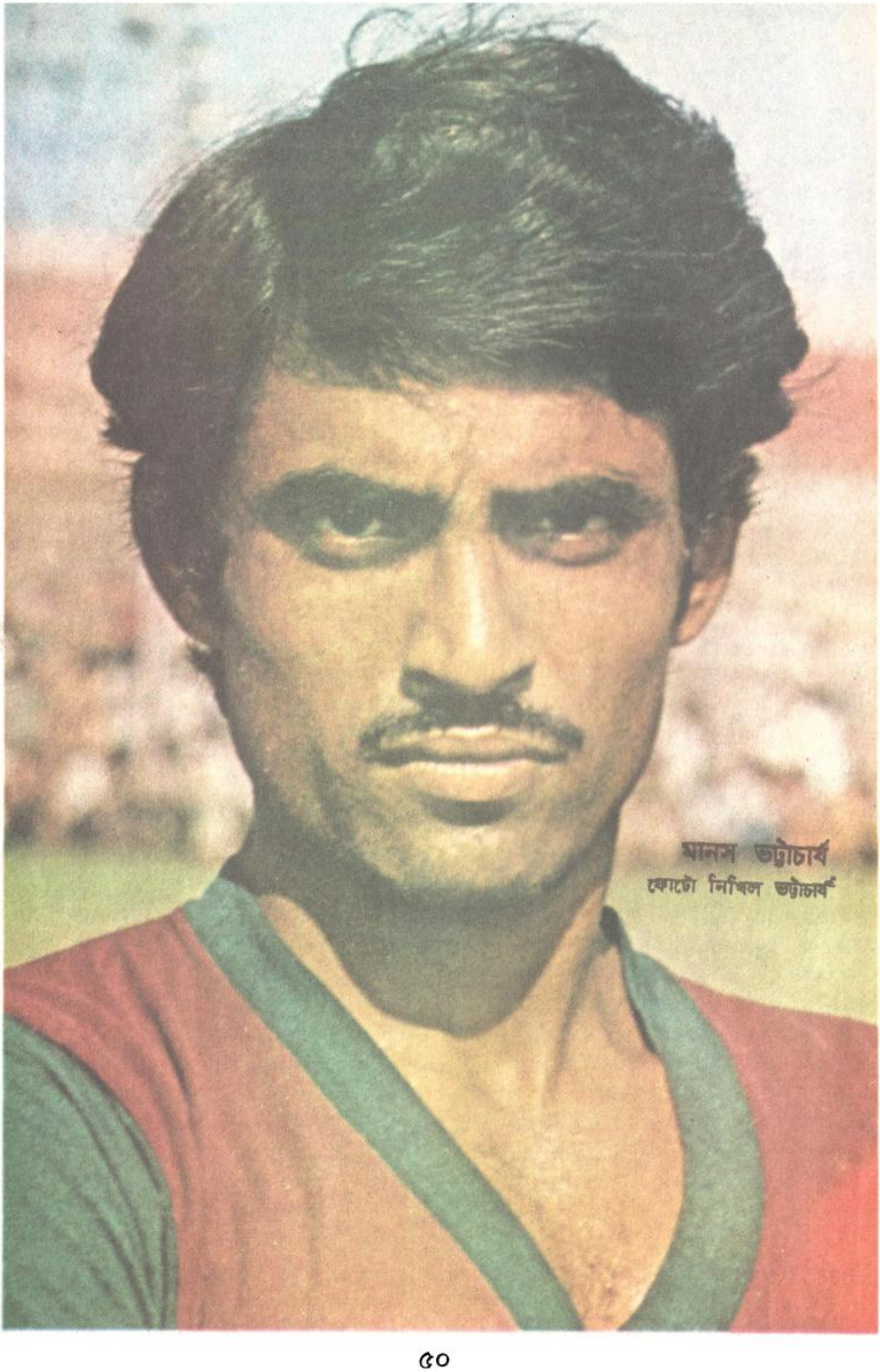

মানস ভট্টাচার্য
ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ফুটবলে ডিস্টিংশন

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

বিশ্বাস করুন, আমি বিন্দুমাত্র দুঃখ পাব না—যদি না হাইয়েস্ট স্কোরার হ'তে পারি। আর, তা ছাড়া ওটা আমার ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন মাত্র। তার থেকে অনেক, অ—নে—ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল আমার প্রিয় দলের লীগ, আই এফ এ শীল্ড, অন্যান্য ট্রফি পাওয়াটা। সেই পাওয়াতেই আমি সবচেয়ে খুশি হব। হাইয়েস্ট স্কোরার হওয়া না-হওয়াটা আমার কাছে মোটেই বড় নয়।

বলা বাহুল্য, কথাগুলো মোহনবাগানের ফুটবল রাইট আউট মানসকুমার ভট্টাচার্যর। যাকে শুধু 'মানস' বলেই কলকাতা ময়দান চেনে। ১২ আগস্ট রবিবার সকালে, যেদিন ১৯৭৯-র লীগের জন্য মোহনবাগান শেষবার প্র্যাকটিস করল, সেদিন মোহনবাগান টেন্টে ওকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে লীগের শেষ খেলায় সাব্বির জর্জ টেলিগ্রাফকে যতগুলো খুশি গোল দিয়ে হাইয়েস্ট স্কোরার হয়ে গেল? তাহলে?"

এই লেখা প্রকাশিত হবার অনেক আগেই প্রশ্নটির মীমাংসা ও বহুজনের উৎকণ্ঠার অবসান হয়ে গেছে। গোলসংখ্যায় মানস ও সাব্বির সমান-সমান। কিন্তু সে যাই হোক, সেদিন সেই মুহূর্তে তাঁর দৃপ্ত উত্তরে ছোট-খাটো ঐ যুবকটি হঠাৎ যেন মাথায় অনেক বড় হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

মানসের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২৫ এপ্রিল। বাবা সদাব্রত ভট্টাচার্য বাটানগরে বাটার ফ্যাক্টরিতে অফিসার। ওঁরা বাটানগরেই থাকেন। বাবা, মা, দাদা মানবকুমার, বৌদি এবং এক বোন নিয়ে ওঁদের পরিবার। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁরা যখন আসেন, বাড়ির আবহাওয়া আরও আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠে।

মানস তখন নিউল্যান্ড প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়েন। সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খালি পায়ে রাবারের বল খেলতেন। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাই বটে। দিল্লি কাঁপিয়ে বাটানগর স্কুল সুব্রত কাপ জিতে আনল। ওদের এই কৃতিত্ব আট বছরের মানসকে দারুণ অনুপ্রাণিত করেছিল। বুঝতে পারলেন, স্বপ্নের দল মোহনবাগানে খেলার পথে প্রথম পদক্ষেপ এইরকম কোনও প্রতিযোগিতাতেই করতে হবে। সুযোগ এল কয়েক বছর পরে। ১৯৭১-এ গুজরাটে গান্ধীনগরে সর্বভারতীয় স্কুল গেম্‌সে বাংলা ফুটবল দলের রাইট আউট খেললেন মানস। তখন তিনি বাটানগর হাই স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র। মজার কথা, তাঁর বুট পরে খেলা, আর স্কুল টীমে নিয়মিত সুযোগ পাওয়া — সবই ঐ বছরেই শুরু! মানসের সময়ে যাঁরা ফুটবল খেলতেন তাঁদের মধ্যে আছেন শঙ্কর অধিকারী (এরিয়ান), শঙ্কর ঘোষ (রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব), সন্দীপ দে (পোর্ট ট্রাস্ট)।

সর্বত্রই বাবা-মা'রা ফুটবলকে একটা ভয়-মেশানো সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। মানসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। খুব উৎসাহ দিতেন দাদা, বড়দি। দাদা বাটানগর স্কুল টীমের রেগুলার। আর বিজয়ী বাটানগর স্কুল দলের ক্যাপ্টেন অমিতাভ ঘোষ। মানসকে কলকাতার মাঠে আনেন ক্যালকাটা জিমখানা-র গোলকীপার স্বপন লাহিড়ী। ভবানীপুরের 'মর্নিং স্টার'-এর হয়ে 'আণ্ডার-হাইট'দের প্রতিযোগিতায় খেলেই মানসের ফুটবল জীবনের কলকাতা-অধ্যায়ের শুরু। স্বাভাবিক-ভাবেই মানসের পরবর্তী দল এবং ঘেরা মাঠের প্রথম দল ক্যালকাটা জিমখানা। ১৯৭৩, ১৯৭৪ বছর দুটো ওখানেই কাটে। মোহন-বাগানের সমর্থকরা অনেকেই ভুলে গেছেন যে, ১৯৭৩ সালে লীগে মোহনবাগান ড্র করেছিল 'ক্যালকাটা জিম'-এর সঙ্গে। এটাই বা কার মনে আছে যে, মোহনবাগানের সুরজিতের দেওয়া গোলটি শোধ করেছিলেন তাঁদের নয়নের মণি মানস। প্রথম ডিভিশনের দ্বিতীয় খেলাতেই (প্রথমটা ছিল ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিরুদ্ধে) গোল, এবং প্রিয় দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। এরিয়ানে মানস খেলেন ১৯৭৫ ও ১৯৭৬-এ। ১৯৭৬-এ তাঁরই করা গোলটি ইস্টবেঙ্গল যে-ভাবে শোধ করেছিল তাতে লাইন্সম্যান স্বপন শিকদার সমালোচনার পাত্র হন। যা-ই হোক, সে বছরের ঐ ১—১ ফল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নটিকে প্রভাবিত করে-ছিল। সাতাত্তর থেকে মানস মোহনবাগানের সুখ-দুঃখের অংশীদার। মোহনবাগানে ওঁকে

আনেন শঙ্কর ব্যানার্জি। শ্যাম থাপার মতোই বড় খেলায় বড় কাজটি করেন মানস। গত বছর ইস্টবেঙ্গলের বিরূদ্ধে গোলটি কি কেউ ভুলতে পারবে? মানস নিজেই বললেন প্রথমটির কথা তিনি ভুলতে পারবেন না কখনও। যেমন পারবেন না গত সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে বাংলার হয়ে করা জয়সূচক গোলটির কথা।

১৯৭৬ থেকে বাংলার জার্সি পরছেন মানস। এবং গতবার শ্রীনগরে সন্তোষ ট্রফিতে দ্বিতীয় লেগে মহারাষ্ট্রের বিরূদ্ধে খেলাটিই এ-পর্যন্ত মানসের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা। প্রথম লেগ-এ ১—২ গোলে পিছিয়ে থেকে যাঁদের গোলে বাংলা দ্বিতীয় লেগে ৩—১ করে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানস। মিহিরকে দিয়েও মানস একটি গোল করিয়েছিলেন। সেদিন খেলে খূব তৃপ্তি হয়েছিল মানসের। যেমন নিজেকে খূব অপরাধী মনে হয়েছিল ১৯৭৩-৭৪ সালে জূনিয়র জাতীয় প্রতি-যোগিতায় কেরলের কাছে বাংলার ০—১ গোলে হারের জন্যে। ঘরের ছেলেরা ঘরে (কৃষ্ণনগরে) হেরে গেল বলেই নয়; ঐ খেলায় মানস যা-ই করেছিলেন, সব ভুল হয়ে গিয়ে-ছিল।

১৯৭৭-এ মানস ভারতীয় জূনিয়র যূব দলে খেলেন। ঐ বছরই ভারতের জার্সি গায়ে উঠেছে। আফগানিস্তান সফরের সূযোগ পেয়ে।

মানসের নিজের পজিশনে প্রিয় খেলোয়াড় পি কে ব্যানার্জি। এ-ছাড়া যাঁদের খেলা ওঁর প্রিয় তাঁরা শঙ্কর ব্যানার্জি, গৌতম সরকার ও সূধীর কর্মকার। বস্তুত শঙ্কর ব্যানার্জিই মানসের ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পেলে ওঁর আদর্শ, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। প্রিয় কোচ পি কে ও অরূণ ঘোষ।

হ্যাঁ, ভারতীয় দলে নিয়মিত স্থান পাওয়ার ইচ্ছা মানসের আছে। "বাংলা দলেই রেগূলার চান্স পাই আগে, তারপর।"

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, মানস লেখা-পড়াতেও কম যান না। আশূতোষ কলেজ থেকে 'ডিস্টিংশন' নিয়ে বি. এস-সি। ডাক্তারি পড়া হয়ে ওঠেনি ফূটবলের টানে। মানসের তাতে দূঃখ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিনি। তবে ফূটবল-প্রেমিকদের নিশ্চয়ই নেই। কারণ মানস এর মধ্যেই আর একটা ডিস্টিংশন পেয়ে গেছেন। ফূটবলে। ঠিক বলিনি?

নতুন বই

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়
- শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ১২৲
- স্বামিজীর জীবন কথা ১২৲
- মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১০৲

কিশোর সাহিত্য

কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়ের আরও বই
- ছোটদের সুভাষচন্দ্র ২৲
- ছোটঃ রামকৃষ্ণ ২৲ ছোটঃ টলস্টয় ২৲
- ছোটঃ নেতাজী ২৲ ছোটঃ ভূদেবচন্দ্র ২৲
- ছোটঃ আনন্দমঠ ৩৲

অমরনাথ রায়
- বিজ্ঞানের খোস গল্প ৬৲

জে. এইচ. প্যাটারসন্
- সাভোর মানুষখেকো ১০৲

লীলা মজুমদার
- ভারতের উপকথা (১ম) ৪৲ (২য়) ৫৲

মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত
- ভয় দেখান ভয়ংকর [১-৭] প্রতি খণ্ড ৪৲

চিরঞ্জীব সেন
- অলিম্পিকের গল্প ৫৲
- আশ্চর্য নিখোঁজ ৬৲
- আজও রহস্য ৫৲
- রক্ত কল্লোল ৫৲

সুজিতকুমার নাগ
- মায়াময় রূপকথা ৫৲

শিবরাম চক্রবর্ত্তী
- বিশ্বপতির অশ্বমেধ ৫৲

নির্মল ঘোষ
- জঙ্গলে একা ৬৲

মহাশ্বেতা দেবী
- জাতক কাহিনী (২য়) ৩৲

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- দেবী চৌধুরাণী ৩৲

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- ঈশ্বরের সেনাপতি ৫৲

সম্রাট সেন
- সিংহাসনে রাজা নেই ৫৲

শক্তিপদ রাজগুরু
- বনে গেলেন গবুদা ৫৲

জগন্নাথ বিশ্বাস
- শিকারী চিতা ৫৲

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, ফোন ৩৪-৬২৬৮

গোলের ফাঁদ ভুলের ফাঁদ

ফাইটার

সুরজিৎ সেনগুপ্ত বলটাকে মাটিতে ড্রপ দিতে দিতে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগোলেন। মগন সিং সেইমতো প্রস্তুত হলেন না। 'সেই-মতো'—তার মানে? শুরু থেকেই বলি।

১৯৭৪ সালের এশিয়ান গেমস হচ্ছে তেহরানে। একটি পুল ম্যাচে ভারতের বদলী রাইট উইঙ্গার হিসেবে সুভাষ ভৌমিকের জায়গায় মাঠে নামলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। বাকি তিন ফরোয়ার্ড অধিনায়ক মগন সিং, হাবিব এবং অমর বাহাদুর। তখনই কর্নার-কিক স্পেশালিস্ট হিসেবে সুরজিৎ চিহ্নিত হয়ে গেছেন।

কোচ পি কে ব্যানার্জি প্র্যাকটিসের সময় সুরজিতের কর্নার কিককে ঘিরে একটি পরি-কল্পনা করেছিলেন। কথা ছিল, ঝানু স্ট্রাইকার মগন সিং লক্ষ করবেন, কর্নার কিক নিতে যাবার সময় সুরজিৎ কী করেন। সুরজিৎ বল হাতে নিয়ে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগোলে বুঝতে হবে বল গোলকীপারের মাথা টপকে সেকেণ্ড পোস্টে ফেলবেন। মগনের কাজ হবে আগের থেকে প্রস্তুতি নিয়ে, কিন্তু একটু দেরিতে সেকেণ্ড পোস্টের দিকে ছুটে গিয়ে হেড করে গোল দেওয়া। সুরজিৎ বল গড়িয়ে গড়িয়ে পা দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেলে বুঝতে হবে বল রাখছেন ফার্স্ট পোস্টের ওপর। মগনের কাজ হঠাৎ ফার্স্ট পোস্টের দিকে ছুটে গিয়ে হেড নেওয়া। সুরজিৎ যদি বল মাটিতে ড্রপ দিতে দিতে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে যান, তাহলে তিনি করবেন লো ড্রাইভ—প্রায় হাঁটু-সমান উচ্চতায় প্রচণ্ড জোরে শট। মগনের কাজ হবে সময়মতো এবং জায়গামতো পা ছুঁইয়ে দেওয়া।

সুরজিৎ মাঠে নামার মিনিট তিনেক পরই ভারত একটি কর্নার কিক পেল। সুরজিৎ বল ড্রপ দিতে দিতে কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে এগোলেন। যে-কথা শুরুতে বলেছি, মগন সিং সেইমতো প্রস্তুত হলেন না। আসলে,

কেভিন কীগান

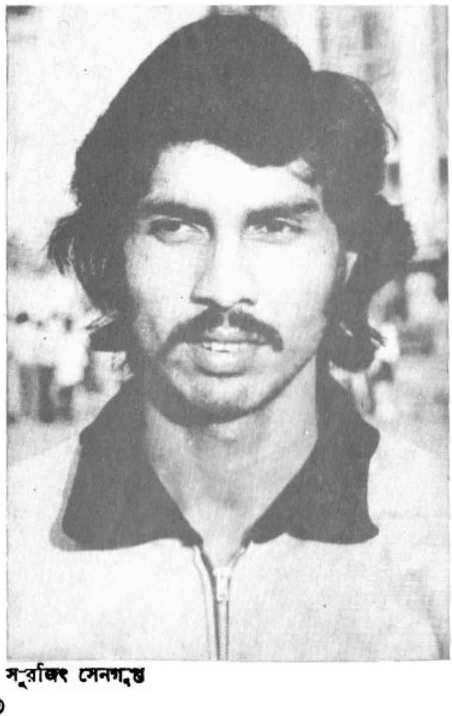

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

খেলার উত্তেজনায় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কোন্‌টা কিসের ইঙ্গিত। সুরজিৎ বল ড্রপ দিতে দিতে এগোতেই তিনি ভাবলেন, বল আসছে ফার্স্ট পোস্টের উপর। সুরজিৎ কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্দান্ত লো ড্রাইভ করলেন। মগনকে বিস্মিত করে প্রচণ্ড বেগে বল উল্টো দিকের সাইড লাইন অতিক্রম করল। সুরজিৎও বিস্মিত হলেন মগন সিংকে ফার্স্ট পোস্টের দিকে তীরবেগে ছুটে যেতে দেখে।

তুমি কি
তোমার এগার-বার ক্লাসে
'শিক্ষা' নিয়ে পড়ছ ?
তাহলে তুমি নিশ্চয়ই
ডঃ অরুণ ঘোষের লেখা
উচ্চ মাধ্যমিক
শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান
বইখানি পড়বে

এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ঠাণ্ডা মাথায় কীভাবে এই ধরনের পরিকল্পনা সফল করতে হয়, তা দেখা গিয়েছিল ১৯৭৪ সালেরই এফ এ কাপ সেমি ফাইনালে। ভিলা পার্কে লিসেস্টার খেলছে শক্তিশালী লিভারপুলের সঙ্গে। প্রথম খেলায় কোনো গোল হয়নি। সুতরাং রিপ্লে-তে দারুণ উত্তেজনা। এইদিন পরিকল্পনামাফিক গোলের এক অনবদ্য নির্দশন রাখলেন লিভারপুলের তিন ফুটবলার। কর্নার কিক নিতে গেলেন ক্রিশ ললার। জন টোলার সেকেণ্ড পোস্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছুটে গেলেন—তাঁর সঙ্গে লিসেস্টারের দুজন ডিফেণ্ডার। ললার কিন্তু করেছেন একটি দুরন্ত লো ড্রাইভ। তীর বেগে ছুটে গিয়ে বুটের বাইরের দিকে বল ছোঁয়ালেন বিশ্বখ্যাত কেভিন কীগান। গোল। কীগান পরে লিখেছেন, এই প্র্যাকটিসে তিনি কয়েক হাজার বার গোল করেছেন। কিন্তু সেই ম্যাচে এইভাবে প্রথম গোল পেলেন। সবটাই নিখুঁত পরিকল্পনার ফল।

পরিকল্পনা সফল করার জন্য মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই। বড্ড কঠিন কাজ। না হলে, সাব্বিরের মতো দঁদে স্ট্রাইকার এমন ভুল করবেন কেন? এবার ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে গোল থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে ইস্টবেঙ্গল একটি ফ্রি কিক পেল।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং দেবরাজ পাশাপাশি দাঁড়ালেন। দেবরাজ হঠাৎ মহমেডানের গোলের দিকে ছুটে যেতেই দু-তিন জন ডিফেণ্ডার এঁর দিকেই ঘুরে গেলেন। সবাই ভাবলেন সুরজিৎ দেবরাজকেই বল বাড়াবেন। কথা ছিল, এই অবস্থায় সুরজিৎ দেবরাজকে বল না দিয়ে চীপ করে বল তুলে দেবেন বাঁ দিকের পোস্টের সামনে এবং সাব্বির ছুটে গিয়ে সেই বল গোলে পাঠাবেন। মুশকিল হল এই যে, উত্তেজনার মুহূর্তে সাব্বির পরিকল্পনার কথা ভুলে গিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং-এর ডিফেণ্ডারদের মতোই ভাবলেন যে, সুরজিৎ বল দেবেন দেবরাজকে। সাব্বির যখন আসল ব্যাপারটা বুঝলেন, তখন দেরি হয়ে গেছে। তিনি কোনোরকমে বল ধরলেন বটে, কিন্তু সেই বল ধরার অথবা রোখার জন্য ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছেন গোলকীপার এবং আরো তিনজন ডিফেণ্ডার।

শীল্ড পেল মোহনবাগান

অশোক দাশগুপ্ত

হ্যাঁ, আই এফ এ শীল্ড এবারে কলকাতাতেই থাকল। শীল্ড শুরু হবার আগে শ্যাম থাপা বলেছিল, "শীল্ড জরুর কলকাতায় থাকবে।" কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বর সাউথ কোরিয়া-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের বাইশ মিনিটে কিম হং সুপের শট ভাস্করকে ফাঁকি দিয়ে নেটে জড়িয়ে যেতেই সন্দেহ দেখা দেয়। পরের উনিশ মিনিটে সেই সন্দেহ গভীর আশঙ্কায় পরিণত হল। কিন্তু একচল্লিশ মিনিটে প্রতিভার স্পর্শে সেই আশঙ্কার কালো মেঘ কেটে গেল। চিন্ময় থেকে সুরজিৎ, সুরজিৎ থেকে মিহির, মিহির থেকে আবার সুরজিৎ—তারপর—তার পরের কয়েকটি মুহূর্ত সোনার ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। শরীরের সামান্য ঝাঁকুনিতে কেটে গেলেন দক্ষিণ কোরিয়ার দু'-দুজন ডিফেন্ডার, সুরজিৎ তখন ডান দিকে গোল থেকে কঠিন অ্যাঙ্গেলে, সেন্টার করলে কি গোল হতে পারে? কিন্তু এই সেই বিপজ্জনক জায়গা, যেখান থেকে অঘটন ঘটাতে পারেন সুরজিৎ। শীল্ডের উপর বিদেশী হানার পথ রুদ্ধ করার জন্য সেই অঘটনই তিনি ঘটালেন। দিন কয়েক আগে সুরজিৎ একা প্র্যাকটিস করছিলেন তাঁর প্রথম গুরু অচ্যুত ব্যানার্জির কাছে—যিনি সকালে সাব-জুনিয়র ফুটবলারদের খেলা শেখান। ঐ দুরূহ কোণ থেকে পর পর ষাট-সত্তরটি শট নেবার জন্য অচ্যুত ব্যানার্জি বলেছিলেন। নির্ভুল শটের পর গুরু বলেছেন, "দুঃখ লাগে, এসব পারিস, অথচ মারিস না কেন?" ১১ সেপ্টেম্বর সুরজিৎ সেনগুপ্ত মেরেছেন এবং পেরেছেন।

আরেক বিদেশী টীম কুয়েতের কাজমা ক্লাবকে অবশ্য বিদায় দিয়েছিল বি এন আর। এবং তাই, শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দেখা হল সেই দুই বাঘের—যাদের লড়াই চলছে, চলবে

কিন্তু ১৬ সেপ্টেম্বরের বিকেলে লড়াই ছিল না, ছিল একটি টীমের ভাঙতে-ভাঙতে

সুযোগের সন্ধানে শ্যাম   ফোটো তপন দাস

এগিয়ে চলা। গৌতম সরকারের পা থেকে গোলটি এসেছে, কেননা দূর থেকে কামান দাগার আকস্মিকতা ও কার্যকারিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আগের আটতিরিশ মিনিটে

গৌতম গোলে বল পাঠিয়েছেন   ফোটো অলক মিত্র

মানস এগোচ্ছেন ফোটো অলক মিত্র

এবং পরের বাহাত্ত মিনিটে গৌতমের মোহনবাগান অনেক অনেক গোলের সহজ রাস্তা গড়েছে। কিন্তু শুধু কি গৌতম?

নিশ্চয় না। অমন সুসংবদ্ধ সংগীতের মতো ফুটবল এক বা দু'জন নেতার মুখাপেক্ষী অবশ্যই, কিন্তু অন্যদের ভূমিকাও চমকপ্রদ হওয়া চাই। গৌতম যদি মধ্য-মাঠ থেকে পরিচালিত করে থাকেন আক্রমণের ঝড়, তাহলে পাশে দাঁড়িয়ে প্রসূন গড়েছেন প্রতিরোধেরও দেওয়াল—তাঁর ছুরির মতো বাঁ পা এই দিন বিপক্ষকে ফালাফালা করার চেয়েও সুরজিতের পা-কে চোখে-চোখে রাখার কাজে ব্যস্ত ছিল।

আর কেরালা থেকে যিনি কিছু আশঙ্কা এবং অনেক স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, সেই জেভিয়ার পায়াস দেখালেন, বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল খেলে কীভাবে পুরোভাগের নেতৃত্ব দিতে হয়। খেলার আগের দিন সকালে তপন দাসের স্কুটারে প্র্যাকটিসে আসার পথে ছোট্ট দুর্ঘটনায় অল্প চোট পান পায়াস। সেই চোট চতুর্গুণে ফিরিয়ে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের দেওয়ালে। আর তার পাশে শ্যাম থাপা? খেলা-শেষের কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত মরণপণ ফুটবল খেলে প্রমাণ করে গেলেন, তিনি শুধু গোলই করেন না, লড়াই করেন।

এবার লীগ শুরুর আগে দূরদর্শনের এক ইন্টারভিউতে কথায়-কথায় মোহনবাগান কোচকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার আসল সমস্যা তো গোলে, তার কী হবে?" ডুরান্ড এবং রোভার্সে শিবাজির ব্যর্থতা আমাকে এই প্রশ্ন করায় প্ররোচিত করেছিল। পি কে বলেছিলেন, "কেন, প্রতাপ ঘোষ তো এসেছে।" হ্যাঁ, প্রতাপ সত্যিই এসেছে এবং জয় করেছে। কিন্তু কয়েক দিন পরে মোহনবাগান টেন্টে দুঃখ করে শিবাজি আমাকে বলেছিলেন, "আমার সম্পর্কে এমন ইঙ্গিত আপনি দিলেন! দেখবেন, সুযোগ পেলে আমি আবার উঠে আসব।"

শিবাজিকে শীল্ড ফাইনালের দ্বিতীয়ার্ধে উঠে দাঁড়াতেই হল—আহত প্রতাপের জায়গা নেবার জন্য। অন্তত তিনটি কঠিন বল রুখেছে প্রতাপ। সুরজিতের দুরপাল্লার ভাসানো এবং বাঁকানো শটটি গোলে প্রায় ঢুকে যাচ্ছিল। শিবাজি তখন কিছুটা এগিয়ে। শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন, একটু পিছোলেন, এবং তারপর যেন সন্তর্পণে বারের ওপর দিয়ে নেটের মাথায় তুলে দিলেন। এবং মোহনবাগানের মাথায় ঝলসে উঠল গৌরবের শিরমুকুট।

হর্জিন্দরকে রুখে দিয়েছেন শ্যামল — ফোটো অলক মিত্র

রানার মা-বাবা

বিকাশ বসু

রানাদের আমবাগানে মোটা গুলঞ্চের ডালে বসে একটা পাখি দোল খায় আর ডাকে, "কী করছ, কী করছ?"

পাখিটা কি ঠিক এই এই কথাই বলে? কে জানে। পাখিদের ভাষা বোঝা সহজ নয়। রানার মনে হয়, পাখিটা যেন তাকেই প্রশ্ন করছে, "কী করছ?"

সে কোনও উত্তর দিতে পারে না। কী উত্তরই বা তার দেবার আছে। ভরদুপুরে অঙ্ক না কষে সে আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একথা এমনকী পাখিকেও বলা যায় না। অতএব রানা চুপ করে থাকে।

তার এমন চুপসে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। তার অনেক সময় মনে হয়, পাখিটা তার শাসনকর্তা। "কী করছ? কী করছ?" বলে তাকে শাসন করছে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে সে পাখির কথা শুনে ফিরে গিয়ে আবার বইখাতা খুলে বসেছে।

সেদিন সন্ধের সময় সে বন্ধুদের সঙ্গে কাদাজবজবে ফুটবল হাতে হার্জিচণ্ডীর মাঠ থেকে ফিরছিল। বন্ধুরা সব একে একে যে যার বাড়ির পথ ধরল। সকলের শেষে তাদের বাড়ি। এটুকু পথ তাকে একলাই যেতে হবে। হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন কথা বলছে। সঙ্গী বলতে তো একটা কাদামাখানো ফুটবল। তাহলে কে কথা বলবে। সে হাতে-ধরা ফুটবলের দিকে তাকিয়ে দেখল, মানুষের মতোই দেখতে অনেকটা, যেভাবে কাদা মেখেছে তাতে কিছুটা নাক চোখ মুখের আদল আছে। তাই বলে ফুটবল কথা বলবে। ধ্যেত।

সে ভাবতে লাগল, সন্ধে হয়ে গেছে। পাঁচটা চল্লিশের শিয়ালদার ট্রেন এতক্ষণে নিশ্চয়ই মল্লিকপুর স্টেশনে এসে থেমেছে। তার বাবা সাইকেলে চেপে বাড়িতে এসে পড়ার আগেই তাকে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। এই সবই সে ভাবছিল। এমন সময় সে আবার স্পষ্ট শুনল, কে বলছে, "রোজ রোজ কাদা মাখাও, আজকে একটু সাবান মাখাবে?"

রানা এদিকে-ওদিকে তাকাল। না, অন্য কেউ নয়, কথা বলছে তার হাতে-ধরা ফুটবলটাই। আর তার কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। "রোজ রোজ কাদা মাখাও, আজকে একটু সাবান মাখাবে?"

কাদামাখানো ফুটবল একথা বলতেই পারে। রানা ফুটবলকে বলল, "আচ্ছা, এত করে বলছ যখন, আজকে তোমাকে একটু সাবান মাখাব।"

বাড়ি ফিরে রানা প্রথমেই চলে গেল কলতলায়। মায়ের গায়ে-মাখা দামি সাবান নিয়ে বেশ করে মাখাতে লাগল ফুটবলের গায়ে। তার মনে হল সাবান মেখে পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে উঠছে ফুটবল। ফুটবলের মুখে খুশির হাসিও দেখতে পেল সে। বেশ করে আর একবার তাকে সাবান মাখাতে যাবে এমন সময় রানার মা ছুটে এলেন, "এতক্ষণ ধরে কলতলায় কী করছিস রে? ওমা, কী বুদ্ধি ছেলের। গায়ে-মাখা সাবান দিয়ে ফুটবলকে চান করানো হচ্ছে।" সাবানটা রানার হাত থেকে এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

রানা মাকে কিছু বলল না। বলে কী হবে? মা-বাবারা এই রকমই হয়ে থাকে। সে বরাবর দেখে আসছে। কখনো যদি কিছু বোঝবার চেষ্টা করে। ফুটবল তাকে এত করে বলল সাবান মাখাতে, তার কথাটা রাখতে নেই। এর মধ্যে বুদ্ধিহীনতার কী আছে? মায়ের বন্ধু রেবামাসিমা যদি এসে মাকে বলে, তোমার পাউডারটা একটু মাখব? মা কি 'না' বলে? ফুটবল তার কত বড় বন্ধু মা কি তা জানে না। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ফুটবলের সঙ্গে তার আজকের সব কথাবার্তা মাকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু মাকে এসব বলে কী হবে, মা কি বিশ্বাস করবে?

রানা জানে, এরা বিশ্বাস করবে না তার কথা। এমনকী তার অনেক কথায় ক্লাসের বন্ধুরাই হো-হো করে হেসে ওঠে। সাবান মেখে ফুটবল আজ কত খুশি হয়েছে সে কি আর মা বুঝবে? রানা তার নিজের তোয়ালে দিয়ে ফুটবলকে বেশ করে মুছে, তাকের ওপর তুলে রেখে ভাল ছেলের মতো পড়তে বসল।

ইতিমধ্যে তার বাবা অফিস থেকে ফিরেই আবার বই নিয়ে বসেছেন। অফিসের কী একটা পরীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। রানার থেকে একটু দূরে তাঁর নিজের টেবিলে বসে পড়াশোনা করছিলেন তিনি। পড়ছিলেন আর

ছবি মদন সরকার

পেন্সিল দিয়ে দরকারি শব্দ ও লাইনের তলায় দাগ দিচ্ছিলেন।

রানা তার বাবাকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "বাবা, কী বই পড়ছ?"

তার বাবা মোটা বই থেকে চোখ ও পেন্সিল না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন "এটা একটা ইঞ্জিনীয়ারিং বই।"

রানা বলল, "ওতে কী লেখা আছে?"

রানার বাবা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "সে তুমি বুঝবে না।"

রানার মাঝে মাঝে কী যে হয়ে যায়। তার মনে হয়, বুঝিয়ে দিলে সে সব বুঝতে পারে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, অ্যাটম বোমা, স্কাইল্যাব—সব কিছু। সেদিন পণ্টুকাকু এসেছিল, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। খনি থেকে কেমন করে কয়লা তোলা হয় বুঝিয়ে দিল, কী চমৎকার বুঝে গেল সে। বুঝিয়ে দিলে সে সব কিছু বুঝতে পারে। সে বলল, "হ্যাঁ বুঝব। নিশ্চয়ই বুঝব।"

রানার বাবা এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, "বুঝবে? বোঝো, পড়ে দেখো কী লেখা আছে এই বইয়ে।"

প্রচণ্ড শব্দ করে বইটা টেবিলে আছড়ে ফেলে রানার বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেলে রানা নিজের টেবিল ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এল বাবার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা মোটা বইটার কাছে। আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল বইটার গায়ে। সে যখন এভাবে বইটার গায়ে হাত বুলিয়ে চলেছে, তার মনে হল, বইটা বলছে, "দেখলে, তোমার বাবার কাণ্ড? দুম করে আমাকে আছড়ে ফেলে দিল টেবিলের ওপর। আমার বুঝি একটুও লাগে না?"

রানার ইচ্ছে হল বলে, বাবা ঐ রকম। কিন্তু সে কিছুই না বলে মোটা বইটার পাতা ওলটাতে শুরু করল।

বইটার পাতায় পাতায় দাগ। লাইনে লাইনে দাগ। বইটা এবার বলল, "কী দেখছ? এ সবই তোমার বাবার কাণ্ড। পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে আমাকে একেবারে শেষ করে দিলে।"

সত্যি। দাগ বলে দাগ, লাইনের পর লাইনের তলায় দাগ। কোথাও আবার বিশেষ বিশেষ শব্দের তলায় দুটো করে দাগ। তার ওপর এখানে-ওখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট, সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের ছড়াছড়ি। বইটা যাকে বলে দাগে দাগে একেবারে জর্জরিত।

বইটার জন্যে রানার বড় কষ্ট হল। সে আস্তে আস্তে আবার চলে এল নিজের পড়ার টেবিলে। তার জ্যামিতি-বাক্স খুলে নিয়ে এল ইরেজার। তারপর আস্তে আস্তে মুছে তুলে দিল যত ছিল পেন্সিলের দাগ। তার মনে হল বইটা যেন আবার হাসছে।

বাঘা ১

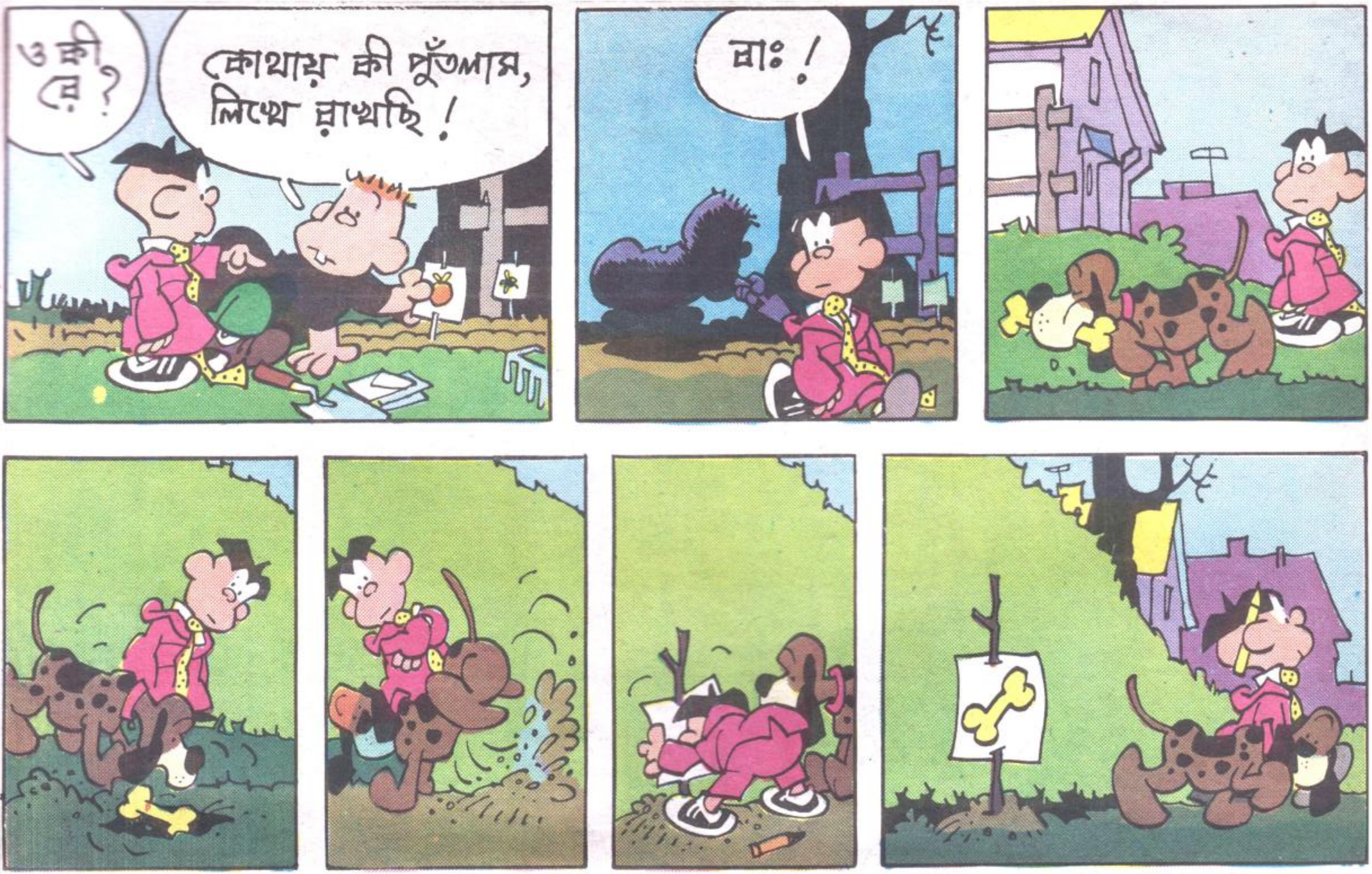

বাঘা ২

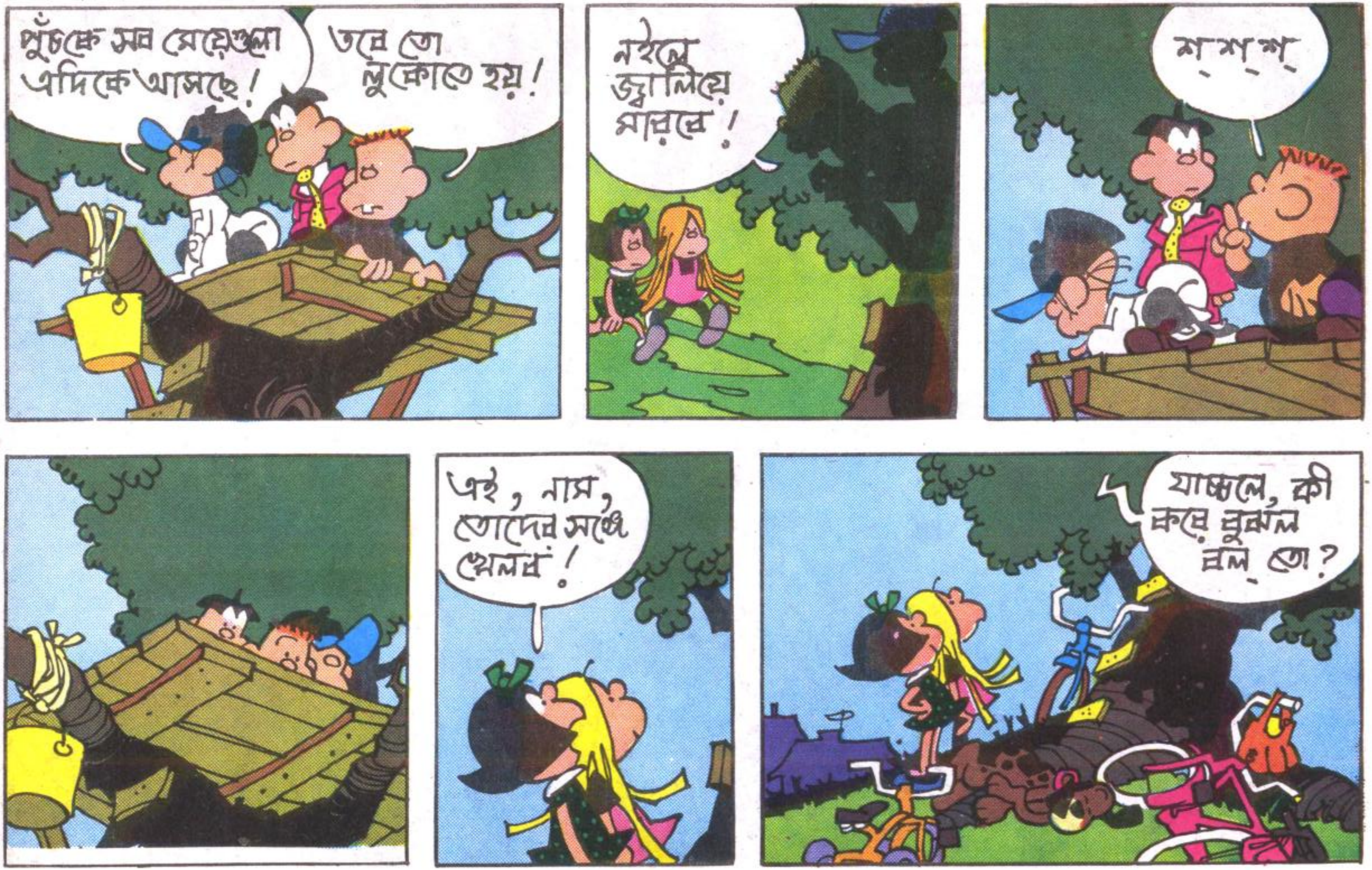
পুঁচকে সব মেয়েগুলো এদিকে আসছে!
তবে তো লুকোতে হয়!
নইলে জ্বালিয়ে মারবে!
শ্‌-শ্‌-শ্‌
এই, নাস, তোদের সঙ্গে খেলব!
যাচ্চলে, কী করে বুঝল বল তো?

হুগলি বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

হুগলি বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৮ সালের ২৬ জানুয়ারি। সেদিন ছিল সরস্বতীপুজো। পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্বর্গত ডাঃ প্রসাদদাস মল্লিকের বাড়িতে তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী বিনোদিনী দেবী এই স্কুলটির গোড়াপত্তন করেন অকালপ্রয়াত পুত্র পরমেশচন্দ্র মল্লিকের স্মৃতিতে। তখন বেতন তিন আনা, ভর্তি ফীও তাই। স্কুলটির বর্তমান খ্যাতি-সমৃদ্ধির নেপথ্যে বিনোদিনী দেবীর আর্থিক দানের সঙ্গে যাঁর নিরলস প্রয়াস যুক্ত হয়েছে তিনি হলেন সম্পাদক ও হুগলির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ধর।

গত বছর বিনোদিনী স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালিত হল। তবুও স্কুলের বয়স বাহান্ন বছর খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হল, শ্রীমতী রেণু বাগচীর প্রধানশিক্ষকতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি। একই স্কুলে পাঁচ দশক ধরে প্রধানশিক্ষকতা করছেন এ-নজির আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। ১৯৩০ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু করে এই লেখার সময় পর্যন্ত শ্রীমতী বাগচী তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুই প্রিয় বিদ্যালয়টির জন্য দিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুত, এই চিরকুমারীর ব্যক্তিগত জীবন বলতে বিশেষ কিছু নেই বা ছিল না। কাজেই স্কুলের সঙ্গে তাঁর জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষকতা জীবনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হয়েছে ঐ দুর্লভ সম্মান।

স্কুলের পাসের হার সন্তোষজনক—প্রতিবারই শতকরা ৮০ থেকে ৯৫-এর মধ্যে। প্রতিবারই কিছু কিছু ছাত্রী 'স্টার' জাতীয় বৃত্তি পেয়ে থাকে।

শ্রীমতী বাগচী মনে করেন যে, পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ের পরিবর্তে এখন এক-একটি গ্রুপে পাস করতে হয় বলে একদিক দিয়ে খারাপ হচ্ছে। যে-যে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা কাঁচা সেই বিষয়গুলিতে সড়গড় হওয়ার চেষ্টা তারা আর করছে না। এর ফলে পরীক্ষা পাসে তাঁদের বিশেষ অসুবিধে না হলেও শিক্ষার দিকে একটা বিরাট ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। যেমনটি হচ্ছে ইংরেজির ব্যাপারে। পদে পদে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু হঠাৎ সকলে ইংরেজি-নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছেন। আশ্বাসের কথা এটাই যে, আমাদের অভিভাবককুল ইংরেজির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন।

শ্রীমতী বাগচীর বিষয় ইংরেজিই। তাঁর মতে ইংরেজিতে ভাল ফল করতে গেলে গ্রামারের উপরে আরও কিছু চাই। সেটা হল ভাষাজ্ঞান। ভাষার উপরে দখল থাকলে লেখার শক্তি আপনা থেকেই আসে। এর জন্যে টেক্সট বই ছাড়াও অন্যান্য ইংরেজি বই পড়া উচিত। যে যত বেশি বই পড়বে ভাষা ও রচনারীতি তার তত বেশি আয়ত্ত হবে। আর একটা জিনিসের দরকার। ইংরেজিতে কথোপকথন অভ্যাস। পরীক্ষায় নম্বর পেতে বা বাড়াতে সহায়তা না করলেও এটা শেষ পর্যন্ত খুবই কাজ দেয়। কারণ কথাবার্তা চালাতে গেলে একটা ন্যূনতম মানের ইংরেজি শিখতে হবে; আর সেটুকু যার আয়ত্তে সে পরীক্ষাতেও ভাল করবে।

বাংলাতেও বাইরের বই পড়তে হবে। নিজে

উপলব্ধি করে সেটাকে নিজের মতো করে লিখতে হলে শুধু টেক্সট বই পড়লে হবে না। আসলে, ভাষা ও রচনাশৈলী সম্পর্কে একটা আকর্ষণ থাকা চাই।

সংস্কৃত সম্বন্ধে শ্রীমতী বাগচীর অভিমত, গোড়াতেই ব্যাকরণের দুরূহ সূত্রগুলির মধ্যে না গিয়ে বা অর্থহীনভাবে মুখস্থ না করে রসোপলব্ধি করা দরকার। এই রসোপলব্ধির অভাব থেকেই বিতৃষ্ণা আর ভয় আসে।

ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত—ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের এই তিনটি বিষয়েই যতটা সম্ভব তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনা করা ভাল। সমধর্মী বা তুলনীয় গদ্যাংশ, কবিতাগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করতে হবে। এবং পরীক্ষার খাতায় উত্তরের মধ্যে সেগুলিকে উপযুক্তভাবে উদ্ধৃত করতে পারলে উত্তরের মান নিঃসন্দেহে বাড়বে। শুধু এই বিষয়গুলিতেই নয়, যে-কোনো বিষয়ের উত্তর সংক্ষিপ্ত এবং 'টু দা পয়েন্ট' হওয়া চাই। আর কোথাও যদি ছবি আঁকার সুযোগ থাকে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

শ্রীমতী বাগচীর মতে ভাল ফল করতে গেলে প্রত্যেকটি বিষয়েই সমান জোর দেওয়া দরকার।

অঙ্ক এবং অঙ্কভিত্তিক বিজ্ঞান বিষয়-গুলিতে ভাল করার রাস্তা একটিই—বারবার অভ্যাস। আর নতুন কিছু অভ্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে দরকার পুরনো পাঠ-গুলি রিভাইজ করে নেওয়া।

ভূগোলে সামনে ম্যাপ রেখে এবং ম্যাপ এঁকে এঁকে পড়লে কখনোই মুখস্থ করার দরকার হয় না। (শ্রীমতী বাগচীকে যখন আমার নিজেরই ভূগোল-ভীতির কথা বললাম উনি হাসি চাপতে পারেননি।) বললেন, মূল সূত্র-গুলো—যেমন কী পরিবেশে বা আবহাওয়ায় বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য জন্মায়—আয়ত্ত করতে পারলে, মুখস্থ করার দরকারটা কী? সেইরকম ইতিহাসের পটভূমিকাকেও ভালভাবে বুঝতে হবে।

অর্ধশতাব্দী ধরে প্রধানশিক্ষকতা করছেন আপনি, আপনার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় কথাটি কী? জিজ্ঞেস করলাম।

—আমরা যদি ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসি, যদি তাদের ঠিকমতো শিক্ষা দিই, তবে তার প্রতিদান তারা দেবেই। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

বিনোদিনীর ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল সুস্মিতা সোম থাকে ব্যান্ডেলে রেল কোয়ার্টার্সে। বাবা শ্রী দেবপ্রিয় সোম রেলকর্মী। মা শ্রীমতী অসীমা সোম স্থানীয় হরনাথ-নীরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দুই দিদি কলেজে পড়েন। এঁরা সবাই সুস্মিতাকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করেন। এছাড়া তিনজন গৃহশিক্ষক আছেন ওর।

সুস্মিতা মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাসম্ভব ভাল ফল করার চেষ্টা করছে। সকালে তিন ঘণ্টা, রাতে চার ঘণ্টা পড়ে। স্কুলের আর গৃহশিক্ষকদের কাজ করতেই কত সময় লাগে! তা ছাড়া লেখা অভ্যাসও করে প্রতিদিন। প্রতিটি বিষয়ে টেক্সট এবং বাইরের রেফারেন্স বই ভাল করে পড়ে নিয়ে টেস্ট পেপার থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি ঠিক করে নেয় এবং উত্তর লিখে দেখিয়ে নেয় কাউকে। বেশি সময় দেয় কোন্ বিষয়ে? ইংরেজি, অঙ্ক এবং বিজ্ঞান গ্রুপের বিষয়গুলিতে। প্রিয় বিষয় ইংরেজি ও অঙ্ক। কিন্তু হবার ইচ্ছে ডাক্তার।

আনন্দমেলার লেখাপড়া বিভাগটি আর কমিক্স সুস্মিতার খুব ভাল লাগে। অবসর সময়ে ও গল্প ও উপন্যাস পড়ে। কিছু কিছু রহস্যোপন্যাসও। লেখার চর্চাও করে কিঞ্চিৎ। সাধ্যমতো খেলাধুলাও। সুস্মিতাদের নিজেদের বাড়ি অশোকনগরে। আদি বাড়ি খুলনায়। কিন্তু ও মনেপ্রাণে মোহনবাগানের মেয়ে। এই একটি বিষয়ে বাড়ির আর কারও সঙ্গে ওর মিল নেই।

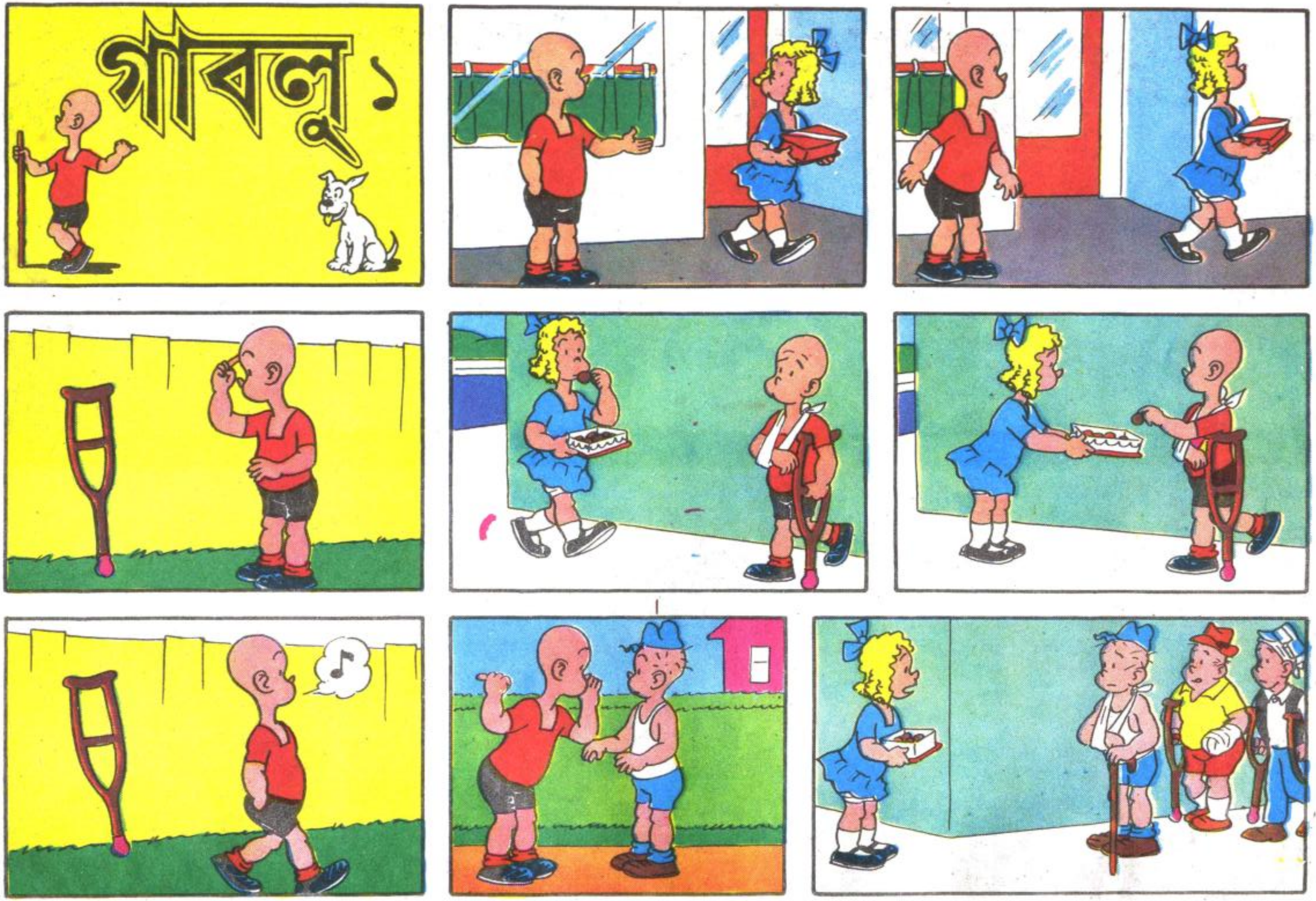
গাবলু ১

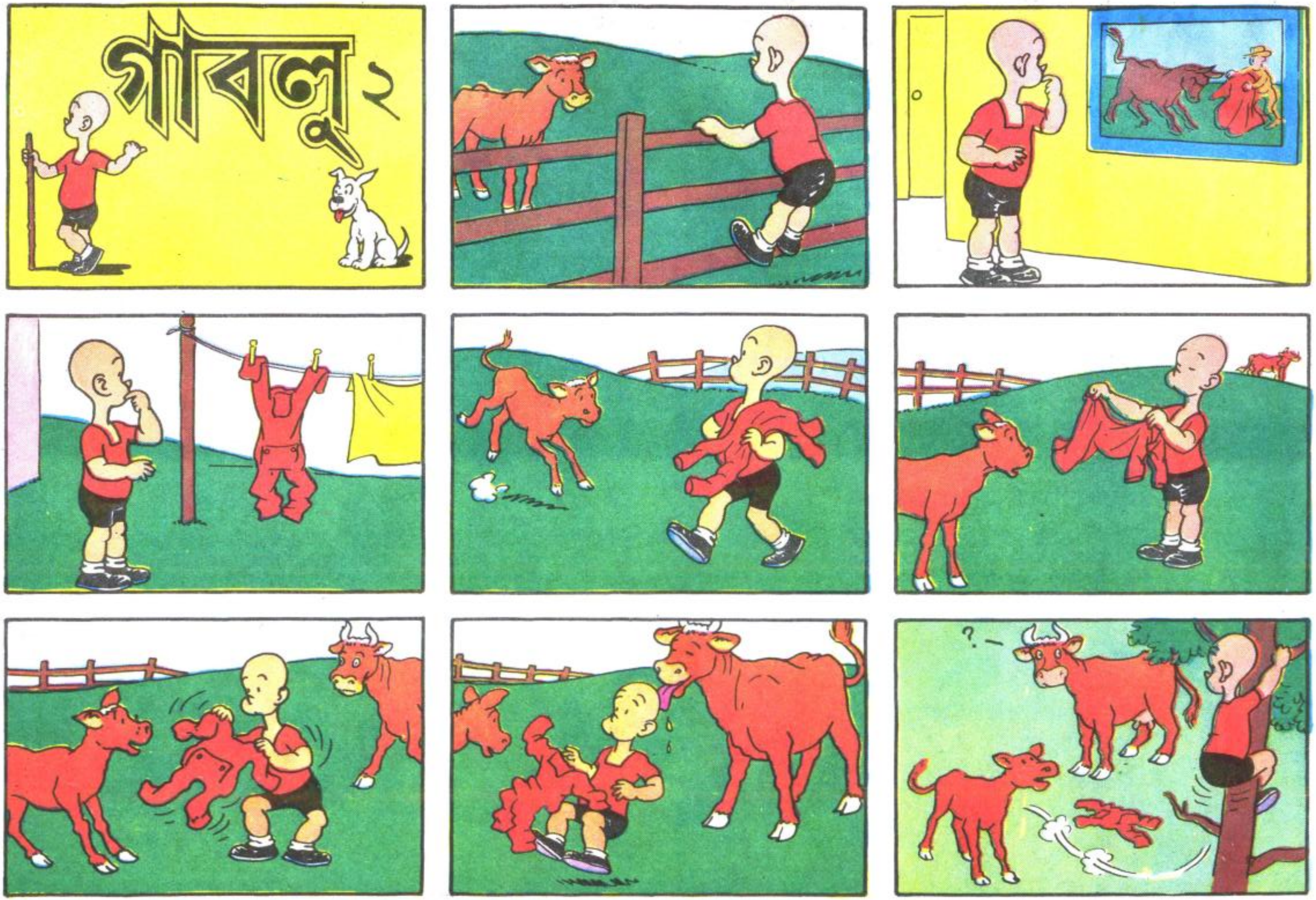
গাবলু ২
?—

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁড়ি

প্রথমবার (১নং আর ২নং ছবি) রেখার টানে (লাল) যে দিকের সিঁড়ির ধাপের অংশ দেখতে পেয়েছ, সেই রেখার (লাল) দিক বদলালেই দেখবে সিঁড়ির ধাপ কেমন তোমার কাছাকাছি এসে পড়ছে। বাড়িঘর আঁকার সময় সিঁড়ি বসাতে কষ্ট হবে না—এইভাবে ভাবলে।

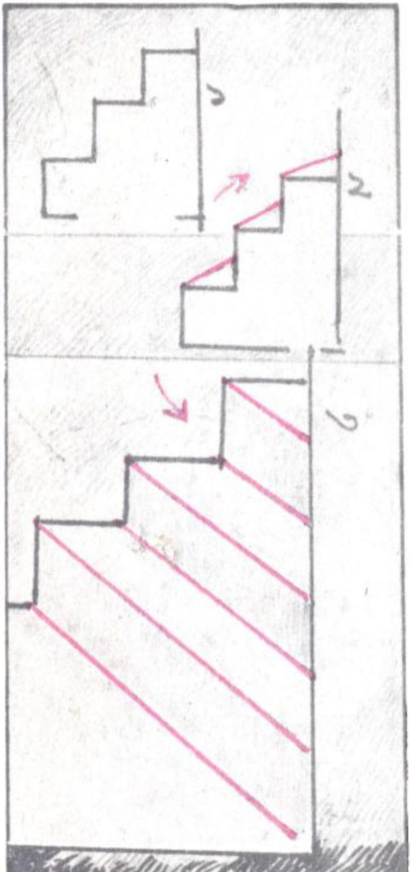

কারিগর

বাঁশের কাজ : টেবিল ম্যাট

প্রথমবার এই কাজের শুরুতে পর-পর পাতি সাজিয়ে বুনেছিলে। এবার বোনার মধ্যে দিয়ে নানান নক্‌শা আনার জন্যে আড়াআড়ি পাতির ওপর প্রথম লম্বা পাতি বসিয়ে সেই পাতির চওড়ার মাপ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় পাতি বসাও। (১ নং ছবি) এবার আড়াআড়ি পাতি দিয়ে প্রথম বোনার সময়ও ঐ ফাঁক রেখে যাও (১ নং ছবি যাতে অন্য রঙের পাতি বুনতে জায়গা থাকে। এবার তিন নম্বর পাতি ব্যবহার করো। (২ নং ছবির মতো) এইভাবে তিন আর চার নম্বর নক্‌শা আনার জন্যে পাতিগুলোকে নকশার নমুনা-মাফিক ওঠা-নামা করে বসাতে থাকলেই নানান ধরনের নকশা পাবে। কাজ শেষ হলে ফিতে দিয়ে মুড়ে নাও।

জেনে রাখো—(১) ম্যাটের একদিকে রঙিন কাপড় বসিয়ে নিলে টেবিলে দাগ হবে না (২) কাজ শেষ হলে ম্যাটের সারা গায়ে পাতলা ফেভিকল মাখিয়ে নিলে শক্ত হবে। (৩) রঙ করার জন্যে গামলা বা যে-কোনও পাত্রে জল-রঙ গুলে পাতিগুলো ডুবিয়ে তুলে নিয়ে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

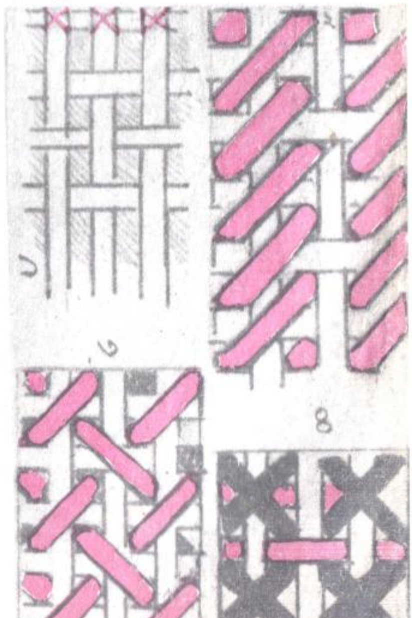

nbt

এ বছর আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ

কোনো ছোট্ট বন্ধুর জন্য এ মাসে কোনো বই কিনেছেন কি ?

মন ভুলানো গল্প, চেয়ে থাকার মতো ছবি আর অবাক হবার মতো নতুন নতুন বিষয়—এই নিয়ে আমাদের ছোটদের বই

মুল্য ঃ দেড় টাকা এবং আড়াই টাকা

এন বি টি বুক সেণ্টার ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

অন্যান্য যাদের কাছে আছে

ষ্টার বুক হা স ৬৫-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **উষা পাবলিশিং হাউস** ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭২ ● **ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স** ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সিনহা বুক এজেন্সী** ৭৯/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ● **সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী** ২২, রাজা উডমাণ্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১ ● **চৌধুরী সেলস কনসার্ন** । সকোনিয়া, বর্দ্ধমান ● **সেলস এম্পোরিয়াম, পাব্লিকেশন্স ডিভিশন** ৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া

শত্রুর বিনাশ
CANDY
SUGAR
শত্রুদন্ত-ভক্ষক (COOH*) দন্ত-প্রদেশ বিনাশের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সেনা দলকে প্রশিক্ষিত করছে।
সেনাপতির কাছে সমাচার পৌঁছলো।
বিনাকা-এফ'কে এখুনি আমাদের ডেকে পাঠানো উচিত। আমাদের যে যুদ্ধের হাতিয়ারের অভাব, দন্ত-ভক্ষক তা জানে।
বিনাকা-এফ যুদ্ধের এই আহ্বানকে স্বীকার ক'রে নিল।
বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ও বিনাকা টুথব্রাশের সাহায্যে আমরা নীচ দন্ত-ভক্ষককে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেব।
BF
দন্ত-প্রদেশের নিয়মিত সেনারা দিনরাত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।
সময়—সোমবার, ডিসেম্বর ৮, কখণ ৯—রাতের অন্ধকারে, দন্ত-ভক্ষক করল আক্রমণ।
কিন্তু বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে মোক্ষমভাবে তাদের প্রতিরোধ করল।
পালাও সবাই! নয়তো মারা পড়ব!
এইভাবে বিনাকা-এফ ও দন্ত-প্রদেশের সৈন্যেরা মিলে দন্ত-ভক্ষকের সৈন্যদের বিনাশ করল।
Binaca
দন্ত-প্রদেশের সেনাদের এ এক মহান বিজয়!
এর সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার ও প্রশিক্ষণের তার মানে বিনাকা ফ্লোরাইড ও বিনাকা টুথব্রাশের।
Binaca Fluoride
Binaca Fluoride
* দাঁতের এনামেল নষ্ট ক'রে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টিকারী কার্বোক্সিল অ্যাসিড গ্রুপের ফর্মুলা।
বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্ত-ক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—বিনাকা ফ্লোরাইড